একক ৯ ❑ গল্প হেকিম সাহেব : মনোজ মিত্র

পর্যায় ঃ ৩ একক ঃ ৯

৯.১ ❑ নাট্যকার মনোজ মিত্র : জীবন ও নাট্যকর্ম

৯.২ ❑ মনোজ মিত্রের নাট্যকৃতি

৯.৩ ❑ মনোজ মিত্র রচিত অভিনীত নাটক

৯.৪ ❑ 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের সংক্ষিপ্তসার

৯.৫ ❑ গল্প হেকিমসাহেবের নামকরণ

৯.৬ ❑ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

৯.৭ ❑ গল্প হেকিমসাহেবের সংলাপ ও ভাষা

৯.৮ ❑ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'গল্প হেকিম সাহেব' সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়া

৯.৯ ❑ গল্প হেকিম সাহেব : মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৯.১০ ❑ প্রশ্নাবলী

৯.১১ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৯.১ নাট্যকার মনোজ মিত্র : জীবন ও নাট্যকর্ম

এ সময়ের অন্যতম খ্যাতিমান, শক্তিশালী ও জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র। সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে গল্প লিখতে শুরু করেন। বসিরহাটের কাছে দণ্ডীরহাট স্কুলে এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় গল্প লিখতেন। "বসুমতী", "ছোটদের পাততাড়ি' 'কবিতা' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হতো। বন্ধুদের উৎসাহে প্রকাশ করেছিলেন 'অন্যলোক' নামে গল্প সংকলন। দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি। ভূমিকা লিখেছিলেন তাঁদের সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে নাটক ও থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনয়, নির্দেশনা ও নাটক লেখা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষ। শহর থেকে জেলা, গ্রাম থেকে নগরের প্রায় সর্বত্রই তিনি প্রশংসিত ও আদরণীয় হয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় শ্রেণীর নাটক লিখেছেন তিনি একাধারে সমাজের মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাট্যকার। কলকাতা, মফস্বল, গ্রামগঞ্জ, পাড়ার ক্লাব থিয়েটার, পেশাদারমঞ্চ সবক্ষেত্রেই তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। একাঙ্কের প্রতিযোগিতা থেকে নাট্যচর্চায় তাঁর নাট্যকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হয়েছে।

মনোজ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর—অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার

পুলিশ। মুলজা এখন আর হয়ে গিয়েছে। পার্থসারথি পাকড়াশীরা ভোলার দু-তিন কিলোমিটার দূরে ধুলিহর। বাবা অন্নোকদুলাল মিত্র ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অবিভাজিত পর্ব রাজার ছিলেন আরবীয় সুরাবাসে। ১৯৪৩ সালে এসেসল এসে মহাকরণে প্রবেশ করেছিলেন। মা রাজরানী দেবী। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনিই বড়। বাবার চাকরিতে ঘন ঘন বদলি হওয়ায় ক্লাস সেভেন থেকে স্কুল জীবন শুরু হয়। এর আগে অবিভক্ত আসিরমণ্ডাই-এর আরাধ্যই পড়াশুনা করেছেন। দেশভাগের পর এসেসল এসে পরিবারটির থাকে বর্ধমানহাটি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে কলকাতার ঝাড়িল হার্ট কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্ণপরে এম. এ. পাস করে (১৯৬৬) অধ্যাপনা জীবিকাকুলন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ড. সাধন ঝট্টিয়ার্জের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণা করতে পারেন। ড. ঝট্টিয়ার্জের প্রয়াণে প্রথমার মেধাপাড়ায় এসে পড়ে। ১৯৭১ সালের জানিয়ারি কলেজে বর্ণপরের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিন বছর পর ভর্তি আসেন প্রফুল্লদল কোপারায় করেছেন। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক নিয়োগে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে ঘরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশির কুমার ভাদুড়ি অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি অসাধিক ছাত্রছাত্রীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায় করে নেন।

১৯৪৭ সালে পার্থসারথি চৌধুরির সঙ্গে বাড়ে যোগেন 'মুক্তধরা' পরিবার। এই সালে 'পাথর পাঁচালি' ও 'চিঠি' পরিকে অভিনয় করেন। তিনি তাঁর প্রথম পরিক 'মুক্তার চোখে জল' (একাঙ্ক) পরিকটি লেখেন ১৯৪৮ সালে। 'চিলেন পত্রাবলী' পরিকায় পরিকটি প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৬৬)। ১৯৪৯-৪ 'মুক্তধরা' পরিবারের। পরিকটির প্রয়োজন করেন প্রফুল্ল সরকার মুক্ত অনেক মুক্ত নিয়ের ভূমিকায় মুক্তার অভিনয় করেন। আগে সাদের অন্তর্ণ প্রদর্শনায় তাঁকে মুক্তা বলে মেনেই যায়নি। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বৃন্দা নীহার চরিত্রে বন্ধু মোজাম্মি। নির্দেশক পার্থসারথি চৌধুরী নিজু চরিত্রে অভিনয় করেন। এ পরিকে বৃন্দা অভিনয় ও বৃন্দা নীহারের জীবনের কাল পরিণতি দেখানো হয়েছে। মুক্তা অভিনয় জীবনে হয়। সময় হয়ে আসে মৃত্যুর। এ নিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে আসে নানা কল্পনা ও. পরিক খুলতে হয়। তার মাঝি মালা যোগে স্ত্রী নীহার তার মুক্তে পরিচয়ের যোগ যোগে যেন আর বলে—'জীবনে তুমি অনিয়ে পাক করেছ, আমরা মুক্তাকে এ-ঘরে একলা রেখে আসি।' এই মুক্তার ও অভিনয় পরিবারিতে মুক্তার চোখে জল আসে। বিভিন্নর অভিনেতাদের 'মুক্তধরা' দল থেকে কয়েক বছর নির্মিত ছিলেন। শ্যামল যোগের 'সপরি' পরিবারে অন্ধ বারোকলিন অভিনয় করেন। আরণ্য অন্যান্যদের কাছে হয়ে যান রবিনিকেন্দ্র। ফলে কলকাতার সাথে আগের সঙ্গে সম্পর্কিক মুক্তার ঘটে। ১৯৬৪-৫৫ কলকাতার নিয়ে বাড়ে যোগেন নিজস্ব পরিবার 'অভাগর'। ১৯৬৫-৭০ পর্যন্ত এ সংস্থার পরিচালনা করেন। পার্থসারথি চৌধুরী 'মুক্তধরা' প্রকাশে অসমর্থ হলে পরের সমস্যাটি তিনি গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে আজ অবধি তিনি 'মুক্তধরা' পরিবারের নট পরিচালনার ও নির্দেশক। অভাগর ও মুক্তধরে নিয়ে আসার আগে তাঁর লেখা 'অভাগর' (১৯৬৩), 'অভাগরে মধু' (১৯৬৯), 'অভাগ মুলাকার' (১৯৭৫) পরিক সাফল্যের আগে নিয়েছিল বর্ণপরিচয়। 'অভাগর' ও 'অভাগ মুলাকার'-এর পরিচালনা অভিনয়ে তিনি আগে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"১৯৭৫ সালে আমার

'মুখরস'-এ ফিরে আসি। আরণ্যক থেকে এখন পর্যন্ত মুখরসেই কাজ করছি। আরাধন এবং মুখরসে গিয়ে আমার মঞ্চাভাবে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নাটক নিয়ে। তারপর আমি 'চাকভাঙা মধু' নামে নাটকটি নিয়েছিলাম। আমি কখনও থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর সদস্য হইনি। তবে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ একটি-দুটি নাটকে আমি অভিনয় করেছি। যেমন 'অন্ধযাদব', 'অনেক ঘুমঘোর'-এ অল্প কয়েকটি শো-তে অভিনয় করেছিলাম সেটা নিতান্তই বন্ধুত্বের কারণে—সেটা ঠিক অর্থের সঙ্গে থিয়েটার করার জন্য নয়।" (লেখকদের সেবন্তী ঘোষচৌধুরী, 'অন্যঅভিনয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, আগস্ট ২০০৬)

'আরাধন' নাট্যদলে নিয়মিত লেখা নাটকে যেসব অভিনয় করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, পাশাপাশি যেহিত মট্টোপাধ্যায়ের 'পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাকরণটি' (১৯৯৯) নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছাড়া 'পশ্চর্ণ', 'মধুকরণী', 'অভিযুক্তরা' 'অন্ধাদলটি', 'সবচা থিয়েটার' এর মতো অভিনীত নাট্যদলগুলি তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করেছে। মফস্বলের অনেক নাট্যগোষ্ঠী তাঁর লেখা পুরস্কার ও একক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এই মুহূর্তে মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার গ্রুপের মট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তাঁর লেখা 'শেষী সর্বনাম' মঞ্চস্থ করছে। তাঁর মল 'মুখরস' মঞ্চস্থ করছে 'অতীন বাড়ুনি' তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকগুলি হল 'অন্ধযাদব', 'অন্ধযাদব মধু', 'চোখারণ্য চোরারণ্য' 'নরকাসুর', 'শিবের অসাধ্য', 'একক পুনরুক্তি', 'সাজানো বাগান', 'নাচাড়ী শিরে', 'ঘন্টাটি', 'রাজমর্দন', 'টিনের চোরা', 'বিন্দু বাহাদুরের দেহীন', 'অসম্ভাবনার মুক্তমঞ্চ', 'দুটি রাজারা', 'চৌরাস্তায়', 'দর্পণে শয়নশর্বী', 'গল্প হেরিয়ে যাওয়ার', 'শেষী সর্বনাম', 'জাহাজ রাজার', 'অসম্ভবীয়ে', 'দুটি ও সকল রেটিকিলার', 'অন্তরঙ্গদল চোরারাস্তা', 'অন্তর ঘটি', 'যা নেই আমার', 'অন্তর্ধানী বাড়ুনি' ইত্যাদি। একক নাটকগুলির মধ্যে 'মুখুর ঘোরে জল', 'শাখি', 'টিনুর টুনুর', 'চরকল', 'অসম্ভবিজ্ঞান', 'আমি একা বসছি', 'অন্তরের গল্পকার', 'ঘোরে অন্তুল রাত', 'চৌদুল রাত', 'সম্ভাবরাত', 'মধ্যি ভুবের গল্পে' 'অন্তুরের ঘোলকুকুরে', 'একক প্রতিভ', 'আরে বিশ্বাসে', 'অন্তর্ধিন্ন', 'আজার চোটি প্রজার পিটে', 'বাঁধি নাচন', 'অন্তরমুখরা', 'আরাধ্য অন্তুরাধ', 'সম্ভোরাজন', 'অন্তর্ধানি অন্তর্ধানি', 'বাঁচাল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'অন্তরে বাগান' নাটক 'পাশ্চাত্যের বাগান' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বীরণ অন্তর্ধিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া 'চোখারণ্য চোরারণ্য' 'একক পুনরুক্ত', 'সম্ভাবটি', 'দুটির আরাধনি' নাটকগুলির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে। চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনেতা হিসেবে সম্পৃক্ত থাকলেও নিয়মিত কাজ করছে থিয়েটারে। যেমন বিন্দু বিজলীতে নির্দেশনা। যেমন তাঁর নাটক 'সম্ভাবটি' অবলম্বনে 'আরোরাত', 'চোখারণ্য চোরারণ্য', 'আরো একটি টিকেটে', 'দুটির আরাধনি' এবং পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে 'অন্তুরাধা', অনন্ত নিয়োগের আহিনে নিয়ে 'বিনোদুনি', শিবরামের গল্প নিয়ে 'ভর্তিবদি আসা নয়' ইত্যাদি। চোখারণ্যের তাঁর রচিত ও অভিনীত নাটক প্রচুর পরিচর্যাদিত হয়েছে। তাঁর রচিত নাটক ইতোমধ্যে, ট্রিপি, অন্তরিয়া, ঘড়িয়া, পাশ্চাত্যী ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি হল 'অতীত পুনরুক্তি প্রসঙ্গ', 'পাশ্চাত্যের থিয়েটার নিদেশনায়', 'অভিনয় কথা নাটিকথা', 'অভিনয় নিয়েছি অন্তরাত্মক অনে' (আর্টোরাদি অনয় নিয়ের সঙ্গে একত্রে অন্য-টিকোত্তরের 'পুরিকল্প'), 'আমার নাটি 'আরাধে নাদি নিকেতন' ইত্যাদি। নাটকের জীবুক্তি অভিন্ন দেশবরেণ্য অভিনেতাদের নাটিকা প্রসঙ্গ যেহি নাটিকার হিসেবে নিরীশিতরা পুরস্কার (১৯৭৮), যেহি অভিনেতার জন্য বিশ্ব যেবরা পুরস্কার (১৯৮০), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

[illegible]

১.৪ মনোজ মিত্রের মানসভূমি

[illegible]

৯.৩ মনোজ মিত্র রচিত অভিনীত নাটক

'মৃত্যুর চোখে জল (এ)'	১৯৫৮	[illegible] (এ)	১৯৭৯
পাখি (এ)	১৯৬০	মেষ ও রাক্ষস	১৯৭৯
নীলকণ্ঠের বিষ	১৯৬০	[illegible] (এ)	১৯৭৯
মোরগের ডাক	১৯৬১	[illegible] (এ)	১৯৮০
[illegible]	১৯৬২	রাজদর্শন	১৯৮১
অবসন্ন প্রজাপতি	১৯৬৩	[illegible] (এ)	১৯৮১
অশ্বত্থামা	১৯৬৩	[illegible] (এ)	১৯৮১
[illegible]	১৯৬৪	কালবিহঙ্গ (এ)	১৯৮২
[illegible]	১৯৬৪	[illegible]	১৯৮২
[illegible]	১৯৬৫	[illegible] (এ)	১৯৮৩
[illegible] (এ)	১৯৬৬	[illegible]	১৯৮৪
[illegible]	১৯৬৬	[illegible] (এ)	১৯৮৫
[illegible] (এ)	১৯৬৭	[illegible] (এ)	১৯৮৫
[illegible] (এ)	১৯৬৭	[illegible] (এ)	১৯৮৬
[illegible] (এ)	১৯৬৮	[illegible] (এ)	১৯৮৬
চাকভাঙা মধু	১৯৬৯	অলকানন্দার পুত্রকন্যা	১৯৮৮
কেনারাম বেচারাম	১৯৭০	কিনু কাহারের থেটার	১৯৮৮
[illegible]	১৯৭০	[illegible] (এ)	১৯৮৮
পরবাস (এ)	১৯৭০	[illegible]	১৯৮৮
[illegible] (এ)	১৯৭১	[illegible]	১৯৮৯
[illegible]	১৯৭২,	[illegible] (এ)	১৯৮৯
[illegible]	১৯৭৪	[illegible] (এ)	১৯৯০
[illegible] (এ)	১৯৭৪	শোভাযাত্রা	১৯৯০
[illegible]	১৯৭৪	[illegible] (এ)	১৯৯১
[illegible] (এ)	১৯৭৫	দর্পণে শরৎশশী	১৯৯১
[illegible]	১৯৭৬	গল্প হেকিম সাহেব	১৯৯২
সাজানো বাগান	১৯৭৬	[illegible] (এ)	১৯৯২
[illegible]	১৯৭৮	[illegible] (এ)	১৯৯২
দম্পতি	১৯৭৮	[illegible] (এ)	১৯৯৩

[illegible] (অ)	১৯৯৩	কিনু কাহারের থেটার	২০০৫
[illegible] (অ)	১৯৯৪	[illegible] (অ)	২০০৬
[illegible]	১৯৯৫	[illegible] (অ)	২০০৬
দেবী সর্পমস্তা	১৯৯৬	[illegible] (অ)	
ছায়ার প্রাসাদ	১৯৯৭	[illegible] (অ)	
পালিয়ে বেড়ায়	১৯৯৮	ভেলায় ভাসে সীতা	২০০৭
[illegible]	২০০০	[illegible] (অ)	২০০৮
মুন্নি ও সাত চৌকিদার	২০০১	[illegible]	২০০৮
[illegible]	২০০২	[illegible]	২০০৯
[illegible] (অ)	২০০৩	[illegible] (অ)	২০০৯
[illegible]	২০০৩	[illegible]	
[illegible] (অ)	২০০৩	[illegible]	
অপারেশন ভোমরাগড়	২০০৪	[illegible]	২০১০
[illegible] (অ)	২০০৪	ছোট ছোট পাখি	২০১১
[illegible]	২০০৪	[illegible] (অ)	২০১১
যা নেই ভারতে	২০০৪	[illegible] (অ)	২০১২

সুন্দরম নাট্যদলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

[illegible] : অভিনীত ; নাট্যরূপ — পার্থপ্রতিম চৌধুরী;
[illegible] : অভিনীত; রচনা—[illegible]; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
মৃত্যুর চোখে জল (১৯৫৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
নীলকণ্ঠের বিষ (১৯৬৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
[illegible] (১৯৭৪); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
সাজানো বাগান (১৯৭৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
মেষ ও রাক্ষস (১৯৭৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৮১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—দুলাল লাহিড়ী
[illegible] (১৯৮৩); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
অলকানন্দার পুত্রকন্যা (১৯৮৮); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
শোভাযাত্রা (১৯৯১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
গল্প হেকিমসাহেব (১৯৯৪); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
ছায়ার প্রাসাদ (১৯৯৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত

নরক গুলজার (এ) (২০০০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—বিমল দাস
দেবতার গ্রাস (এ) (২০০০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—বিমল দাস
মুন্নি ও সাত চৌকিদার (২০০১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
অলকানন্দার পুত্রকন্যা (২০০৪); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
নাকছাবি (২০০৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
যা নেই ভারতে (২০০৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত

ঋতায়ন নাট্যদলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

অবসন্ন প্রজাপতি (১৯৫৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
মৃত্যুর চোখে জল (১৯৬০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
নদু গুরু (১৯৬৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
সিংহদ্বার (১৯৬৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
নীলা (১৯৬৩); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
তোতা (১৯৬৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
কাল (১৯৬৬)— রচনা : বিমলাদাস অধিকারী, নির্দেশনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনীত
খেলাঘর (১৯৬৮); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৯৬৯); রচনা ; মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অভিনীত ও নির্দেশিত

সুন্দরম ও ঋতায়ন ব্যতীত অন্য দলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

অশ্বত্থামা—রচিত ও অভিনীত, নির্দেশনা—বিভাস চক্রবর্তী; দল : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
নরক গুলজার—রচিত ও অভিনীত; নির্দেশনা—বিভাস চক্রবর্তী; দল : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
(হিন্দি শো-এ অভিনয় করেন)
মোহনের বাগান—রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত; দল : পঞ্চম

মনোজ মিত্র অভিনীত চলচ্চিত্র

ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক	ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক
			ঘরে বাইরে	১৯৮৪	সত্যজিৎ রায়
			অভিমানীর	১৯৮৫	অঞ্জন চৌধুরী
বাঞ্ছারামের বাগান	১৯৮০	তপন সিংহ	বৈদুর্য রহস্য	১৯৮৫	তপন সিংহ
আদালত ও একটি মেয়ে	১৯৮২	তপন সিংহ	আতঙ্ক	১৯৮৬	তপন সিংহ
ছন্দ ঘটক	১৯৮২	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	পরিণীতা	১৯৮৬	নব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কুহুকুল	১৯৮৪	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	লেনদেন লেনদেন	১৯৮৬	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
শত্রু	১৯৮৪	অঞ্জন চৌধুরী	মধু-মাসী-প্রীতি	১৯৮৬	দীন গুপ্ত
মোহনার দিকে	১৯৮৪	বিজয় চট্টোপাধ্যায়	আগুন	১৯৮৮	বিপ্লব ব্যানার্জি

ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক	ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] দূরদর্শন ধারাবাহিক

[illegible]

[illegible] টেলিফিল্ম

[illegible]

মনোজ মিত্র রচিত চিত্রনাট্য

চিত্রনাট্য		পরিচালক
অনুরাধা	কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দিলীপ মুখোপাধ্যায়
কেনারাম বেচারাম	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
চিরসখী	কাহিনি : কমল মিত্র	রাজা সেন
গোধূলি আলো	কাহিনি : সমরেশ মজুমদার	রাজা সেন
বৃষ্টির ছায়াছবি	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	দুলাল লাহিড়ী
ভালোবাসা	মনোজ মিত্র রচিত নাটক 'দম্পতি' অবলম্বনে	শমিত ভঞ্জ
দুর্লভের স্বপ্নের দল	বিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর কয়েকটি ছোটগল্পের সূত্র ধরে	
আরো একটি চিত্রনাট্য	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	

মনোজ মিত্র রচিত যে নাটকগুলির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে

সাজানো বাগান, কেনারাম বেচারাম, নরক গুলজার, দম্পতি, বৃষ্টির ছায়াছবি

দূরদর্শনে মনোজ মিত্র রচিত যে নাটকগুলি পরিবেশিত হয়েছে

পাখি—নির্দেশনা : তৃপ্তি মিত্র, প্রযোজনা : বিভাস চক্রবর্তী
মদন হাকিম — ধারাবাহিক কাহিনি; প্রযোজনা : সুব্রত মুখোপাধ্যায়
কালবেলায়, টাপুর টুপুর, নন্দগোপাল

আকাশবাণীতে পরিবেশিত মনোজ মিত্র রচিত ও অভিনীত বেতার নাটক

ভোরের আগুন দল—রচনা : প্র. না. বি.; অভিনয় : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
(নামটি প্র. না. বি.-র দেওয়া। সেটি ছিল অন্য গল্প। মনোজ মিত্র একটি নাটক লিখে ওই নামটি ব্যবহার করেন)

কুকুর ভোরের ফল—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু, পরিবেশনা : স্বপ্নম
পাখির ভোর—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু, পরিবেশনা : রূপকম
সহধর্মিণী—রচনা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র; অভিনয় : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
আকাশ কুসুম—রচনা : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : ডা দীপক চন্দ্র পোদ্দার
বৃষ্টির ছায়াছবি— রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার
দুর্ভিক্ষ—রচনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; অভিনয় : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : অরবিন্দ পাণ্ডে
একা একা—রচনা : বিমল কর; অভিনয় : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : অজিত মুখোপাধ্যায়
আরো একটি চিত্রনাট্য—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার
কালবেলায় (এ)—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
আবার ফিরে এসো—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার

টাপুর টুপুর—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনায় : সুন্দরম

অহিং কুমার ব্যাঘ্র—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিকল্পনা ও প্রযোজনা : নির্মল চন্দ্র গুহ

দর্পণে শরৎশশী—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনায় : প্রতিকৃতি

কালবেলা প্রেমিক — রচনা : মনোজ মিত্র

ভেলার সিংহাসনে—রচনা : মনোজ মিত্র

অলোকের ঝরনা—রচনা : মনোজ মিত্র

রাজদর্শন—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনায় : বহুরূপী

ছাড়ি রাজা বলছি—রচনা : মনোজ মিত্র; একক অভিনয় : বনী ঘোষ (ধারাবাহিকভাবে পরিবেশিত)

পাঞ্জাবি মিত্র—রচনা : মনোজ মিত্র; (ধারাবাহিকভাবে পরিবেশিত)

কৃষ্ণমতী — রচনা : মনোজ মিত্র

স্বপ্নভাঙার — রচনা : মনোজ মিত্র

শাবকের সন্ধানে — রচনা : মনোজ মিত্র

মেষ ও রাক্ষস — রচনা : মনোজ মিত্র

পরবাস — রচনা : মনোজ মিত্র

গল্প হেকিম সাহেব — রচনা : মনোজ মিত্র

চোখে আঙুল দাদু — রচনা : মনোজ মিত্র ; পরিবেশনায় : থিয়েটার ওয়ার্কশপ

অশ্বত্থামা — রচনা : মনোজ মিত্র ; পরিবেশনায় : থিয়েটার ওয়ার্কশপ

তক্ষক — রচনা : মনোজ মিত্র ; আকাশবাণী পরিবেশিত

আকাশবাণীর জন্য লেখা আরও নাট্যরূপ

নানা রঙের দিন — কাহিনি : প্রভাত কুমার ঘোষ

মাটি — কাহিনি : মহেন্দ্রনাথ মিত্র

এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের আরও তিনটি গল্প-এর নাট্যরূপ

তোরণ — কাহিনি : গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কলাবতী — কাহিনি : অন্নদাশঙ্কর রায়

বাসনা কড়ই — কাহিনি : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হরবোলা — কাহিনি : সুবোধ ঘোষ

এছাড়াও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, বাণী বসু ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর গল্প-র নাট্যরূপ দেন মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্র রচিত অন্য ভাষায় অনূদিত নাটক

ইংরাজি-অনুবাদ

সাজানো বাগান (Banchharam's Orchard — Seagull)

রাজদর্শন (Encounter with the King — Seagull)
ছায়ার প্রাসাদ (Palace in the shadows — Seagull)
গল্প হেকিম সাহেব (A Tale of Hakim Saheb — Seagull)
চাক ভাঙা মধু (Honey from the Beehive — Seagull)
প্রভাত ফিরে এসো (Come back Provat — Translated by Ajit Kumar Ghosh — Sahitya Academi)
টু ইন ওয়ান (Two in One — Translated by Ashok Mukhopadhyay

হিন্দি অনুবাদ

বৃষ্টির ছায়াছবি : এক বুন্দনী ছাব
প্রভাত ফিরে এসো : লৌটি আও প্রভাত
অলকানন্দার পুত্রকন্যা : অলকানন্দা কে বালবাচ্চে; অনুবাদ : নিরঞ্জনরাজ
কেনারাম বেচারাম : কেনারাম বেচারাম
গল্প হেকিম সাহেব : কিস্‌সা হাকিম সাহেব কা; অনুবাদ : সাফুরা মিরজা
চাক ভাঙা মধু : মধুমক্ষী নীল ; অনুবাদ : নূর জহীর
তূফান : তূফান
পরী : পরী ; অনুবাদ : প্রতিভার দাস
দম্পতি : বীরা কোইরাম ; অনুবাদ : সাফুরা মিরজা
সাজানো বাগান : বাগিচা বাঞ্ছারাম কী
মেষ ও রাক্ষস
মৃত্যুর চোখে জল
রাজদর্শন : রাজদর্শন ; অনুবাদ : প্রতিভা আগরওয়াল

অসমীয়া অনুবাদ

কেনারাম বেচারাম
সাজানো বাগান

ওড়িয়া অনুবাদ

কেনারাম বেচারাম
মেষ ও রাক্ষস

পাঞ্জাবি অনুবাদ

মৃত্যুর চোখে জল

তামিল অনুবাদ

মৃত্যুর চোখে জল

মণিপুরী অনুবাদ

সাজানো বাগান

মনোজ মিত্র রচিত গ্রন্থ

অলীক সুনাট্য রঙ্গে। নিবন্ধ গ্রন্থ ১৯৮৮

শব্দরূপ : থিয়েটার থিয়েটার

মনোজ কথা নাট্যকথা, প্রকাশক : আজকাল

অভিনয় থিয়েটারি কথোপকথন সহজ (শোভিনয়টি আমার মিত্রের সঙ্গে একত্রে নাট্য-উপন্যাসের স্মৃতিকথা)

বাংলা নাট্য : হারানো কালি নিরুদ্দেশ, প্রকাশক : দৃষ্টি

নিবন্ধ গ্রন্থ ২০০০

একাঙ্ক একশো বছর

নাটক সমগ্র (পাঁচ খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ। ১৯৯৪-২০০৬ (নাট্য-সংকলন গ্রন্থ)

এছাড়া নাটকের বহু অসংখ্য গ্রন্থ এবং

অনূদিত নাট্য প্রকাশিত প্রকাশ

মনোজ মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থ

ছোটদের থিয়েটার, প্রকাশক : মন গ্রন্থ কুটির

নতুন নতুন নাটক, প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ

পুরস্কার ও সম্মাননা

১৯৭৮ : অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র পুরস্কার

১৯৮০ : শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার

১৯৮১ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৮৩ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৮৫ : শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার

১৯৮৬ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৯১ : নান্দীকার জাতীয় নাট্যোৎসব সম্মাননা
আকাদেমি প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দূরদর্শন অভিনেতার পুরস্কার।

১৯৯৫ : পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম জার্নালিস্ট প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার

২০০৫ : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক

৯.৪ [illegible]

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[illegible]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[illegible]

তৃতীয় দৃশ্য

চতুর্থ দৃশ্য

পঞ্চম দৃশ্য

নিয়েই সে মোহরের আসলের মূর্তিতে বিষ ধতুর দিয়ে রেখেছে। কারদি খাঁ সেকথা বিশ্বাস করে না। সে বলে, অবিলম্বে সোনাল নদিয়া হেকিমের হাতে তুলে দেওয়া হোক। তা নাহলে সে আমির ধতুর তৈরী করতে পারবে না। মৌলবীও সে কথা সমর্থন করে। ফুপু কেঁদে গিয়ে বলে, দরিয়াগঞ্জে যা হেকিম থাকবে, সব মোহর। ইতিমধ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে হেকিমকে টানতে টানতে নিয়ে আসে বরকন্দাজ। হেকিম বলে, তার ধতুরে মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে না। দুধ পরীক্ষা করার কথা বলে। এ কথায় ফুপু ভয়ে পালিয়ে যায়। কারদি খাঁ হুকুমিতে বলে, হেকিমের মতো সজ্জন ব্যক্তিকে কোমরে দড়ি বেঁধে আনা ঠিক হয়নি। হেকিমের কোমরের দড়ি খুলে দেওয়া হয়। হেকিম মুক্ত হলে উপস্থিত ব্যক্তিরা মানুষজন হেকিমের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। এতে কারদির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে অবাক হয়ে দেখে, তার চেয়েও তার প্রজা হেকিম মানুষের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়, অনেক বেশি সম্মানের। নিষ্ফল আক্রোশে এ অপূর্ব অভিনয়ে সে হেকিমকে হাতের লাঠি দিয়ে মারতে থাকে, তাকে জুতো পেটা করেন। মোহরের পায়ে নাকে খত দেওয়ার জন্য হেকিমকে আদেশ দেয়। কারদি তার নিজের এই অন্যায় মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারে না। তাই মোহরকে খাঁচিক করে বলে, 'তুমি তো খাঁই, এবার খুশি তো?' হেকিম মোহরের পায়ের কাছে নাকে খত দিতে বাধ্য হয়। মোহর তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে আনন্দে মেতে ওঠে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

হেকিম সাহেবের উঠোনে এসে দাঁড়ায় নজর ও তাকিয়া। হেকিম, গঙ্গামণি ও হাতেম আছে সেখানে। কারদি খাঁ হেকিমের জন্য খানাপানি পাঠিয়েছে নজর ও তাকিয়াকে দিয়ে। হাতেমের আদায়, 'তুমি খেয়ে ফেলতে...' হেকিম কৃপায় সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দেয়। নজর চলে যাবার সময় হেকিমকে শাসিয়ে যায়, পলাশপুরে যাবার মতলব করলে তার ফল ভাল হবে না। এরপর দলবলকে আবার করে গঙ্গামণির স্বামী টৈমুরের কদুল এসে উপস্থিত হয়। বিদায় আদায় দিয়ে সে বলে, বুড়া ভদ্রলোকের মতো তার মেজাজ হয়েছে। সেই তার শাদের আদিবার হবে না। তাই সে জানটি ছেড়ে দিয়েছে। কোনও কুকর্ম আর সে করবে না। গঙ্গামণি মোহরের মাঝে বাঁচিয়েছে, তাকে আমার করার পরামর্শ দিয়েছে। খানদানির জমি, ক্ষেত, গাছিপালা সব দিয়েছে। সে গঙ্গামণিকে নিয়ে চলে যাবে পলাশপুরে। গঙ্গামণি হেকিমকে পলাশপুরে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করে। পলাশপুরে গেলে অনেক রক্তগোলাপ পাওয়া যাবে। হাতেমকেও সে অনুরোধ করে। হাতেম রাজি হয় না। কিন্তু হেকিম গোলাপ পাবার আশায়, কদুল মনানোর আকাঙ্ক্ষায় পলাশপুরে যেতে রাজি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কদুল নিজমূর্তি ধারণ করে। হাতে তুলে নেয় তেল চকচকে কাতড়া। দুশমন দিয়ে বলে, সে আসল কদুল কারদি খাঁ-র টৈমুরক। সে এসেছে হেকিমের মন বুঝতে, সে পলাশপুরে যেতে চায় কি না। সে কারণেই সে গঙ্গামণিকে নিয়ে বিবি হিসেবে শিখিয়েছে। হেকিম যদি দরিয়াগঞ্জ ছেড়ে পলাশপুরে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে কাতড়া দিয়ে হেকিমকে শেষ করে দেবে। এই বলেই সে কাতড়াটি ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারে। সেটি গিয়ে লাগে হেকিমের ঠিক ডান পায়ে। হেকিম তার একটি পা খোঁড়া হয়ে যায়। কদুল যাওয়ার সময় গঙ্গামণিকেও একাকীভাবে শাসিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জোহরার বাড়ে হেকিমের দাওয়ায় বিদ্যুৎ হেকিম ওষুধ তৈরি করছে। তাকে সাহায্য করছে গঙ্গামণি। অঙ্কুরের সহযোগিতার জন্য সে অঙ্কুরকে আনা করে এনেছে। হেকিমের কাছে স্থায়ীভাবে থেকে কাজ করার ইচ্ছে জানায়। হাকিম তাকে শিক্ষা দেয় যে, তার তৈরি ওষুধ বাতাসের জোগান খায়, শীতল বাতাস খায়, ফুলের সুরভি খায়, ফলের দেহের খায়, মধু খায়, সূর্যালোক খায়, বাতাস সবুজ খায়, আলোক ক্ষুধা খায়। বিদ্যুতের জলপ্রপাত খায়। দুর্বল ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে হলে চাই শক্তি ও সৌন্দর্য। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে জোহরাবাঈ। সে হেকিমের কাছে স্বীকার করে যে, হেকিমের অনুমানই ঠিক। কঠিন ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। রাতে রাতে তার জ্বর হয়, সারা শরীর চুলকায়, চুলকোলে লাল হয়ে যায়, শরীরে গিয়ে কোনও লজ্জা নেই। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে জোহরা। হেকিম তাকে আশ্বস্ত করে বলে, দুনিয়ার বিশ্বাসের চেয়ে একটি ব্যাধির মহলা কখনও বেশি হতে পারে না। ওষুধ সাহচর্য, তেল, জোয়ান, মিঠে পানি, মিঠে ব্যবহার চেয়ে কমই শীতলতর থাকে, বেশি হতে পারে না। তার রোগ সারিয়ে দেবে। তবে সেই রোগের কারণটি জানানোর জন্য চাই সহযোগিতা। গঙ্গামণি জোহরাকে বলে, যে লোকটা তার ঘরে ঢোকাতে, সেই লোকটাকে সে খাইয়ে রেখেছে। অতুলনীয় জোহর কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিরুপায় দোষ স্বীকার করে বলে, সে পলাশপুরের রাজা। মুখাকে সে নিজেই বিষ দিয়ে রেখেছে। উদ্দেশ্য হেকিমকে পরিবারশুদ্ধ তাড়াতে বাধ্য করা। আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে গুলাবি বাঁ। অঙ্কুরিকে সঙ্গে নিয়ে সে জোহরার সামনে আসে। জোহরাকে অপমান করে, তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি হেকিমকে সমাজের কাছে ঠিক সদ্ব্যবহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তৃতীয় দৃশ্য

সময় রাত। পলাশপুরে নম্বুলকি দেওয়ানের বৈঠকখানা। অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছে জোহরাবাঈ-এর গান। হেকিমকে নিয়ে দুখী আসে নম্বুলকির কাছে। নম্বুলকি হেকিমকে দেখে খুব খুশি হয়। হেকিমকে সে নিজেই দেওয়ান দক্ষিণা দিতে চায় তার ওষুধ আবিষ্কারের জন্য। হেকিম জানায়, দেওয়ান সে পেয়েছে, আবিষ্কারটিও করতে পেরেছে। সে এসেছে জোহরাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা করতে। তার কঠিন ব্যাধির দাওয়াই দিতে। দুখী, নম্বুলকি কি রোগের দাওয়াই তা জানার জন্য হেকিমকে চাপ দিতে থাকে। হেকিম কিছু বলতে চায় না। সহসা সেখানে জোহরা এসে জানায়, তার কোনও রোগ হয়নি। আসলে দুখি-জোহরার দল হয়ে ষড়যন্ত্র করে সে তার সততাকে, বাদশাহ ব্যাধিতে ভোগান করতে চায়। হেকিম তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু জোহরাদের দেশায় আসলে তোষকে লুকিয়ে সমাজের দোষ ঢাকিয়ে যায়। দুখী সব খুঁজতে থেকে লাঠালাঠিকা ছিটিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলে। জোহর ফুসফুসে নিয়ে নম্বুলকির টাকা-পয়সা জেবৎ নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় হেকিমের কাছ থেকে ওষুধের বোতাম ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হেকিমকে পলাশপুরে আটকে রাখার কথাও বলে। নম্বুলকি হেকিমকে বলে, একমাত্র পলাশপুরে থেকে যেতে। বিকালবেলায় গ্রামে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, যদি তাদের চিকিৎসা করে যায়। নম্বুলকির প্রস্তাবে হেকিমের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্য

[illegible]

পঞ্চম দৃশ্য

[illegible]

ওষুধ খেয়ে এসেছে। কারণ নবাবপুত্রের ডাক্তার বলেছেন, এই ওষুধ কোনও কাজের নয়। হাবুকি বলে, মিথ্যা কথা। তার ওষুধ খেয়ে বেগমসাহেবা ভালো হয়ে গেছে। এ সংবাদে হেকিম জীবন খুশি হয়। সে খুঁজতে থাকে পুঁথিটি। যে পুঁথিতে লেখা আছে ওষুধ তৈরির প্রণালী। পুঁথির খুঁজে পায়না হেকিম। আমলার বলে, একদিন এই নবাবি বড়ুয়েসাহেব আমিরিয়ে তার অধিকার বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ সেই ওষুধ নবাবের জীবন বাঁচানোর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। হঠাৎ নবাবি বী হেকিমকে আমন্ত্রণ দিয়ে ফিরে যায়। গঙ্গাবেগমি খেতে। ইনামের খাবার পুরস্কার সে পায়নি, সাহেবরা পুরস্কার দিয়েছে নবাবি বী-কে। হেকিম হাসেন্দর সুরে বলে, হায় আল্লা। যে পেয়েছে ইনামের সেই যেন ইনামের খাবার পুরস্কার। হেকিম ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গঙ্গাবেগমি ঝাঁকা থেকে বের করে বড়ুয়েসাহেব। বাড়ির ভিটেতে সে একটা ফোকরের ভাল খুঁড়েছিল। গোপন জেনে যত্ন করে সে লুকিয়েছে লাল ফোকার। হাতের মাটিতে থাকা পুঁথি বের করে আনে। আলমগিরের পুঁথিটি সে খুব যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিল। তারা তখন নতুন স্বপ্নে বিভোর। হেকিমের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করবে, অপূর্ণ আশাকে পূরণ করবে। তারা হেকিমের স্বপ্নকে ব্যর্থ হতে দেবে না। হাতছানিতে ডেকে যাচ্ছে হেকিমের ভিটে। গঙ্গাবেগমি জোছনা ধরে হাঁটে গাঁয়ে। তারা জোগাবে গোপনে ওষুধ তৈরির অঙ্গীকার করে। হেকিমকে ডাকে গঙ্গাবেগমি ঠিক আসা দেখার জন্য, ইনাম লোকটাই ধরার জন্য। হেকিম তখন চিরনিদ্রায় শায়িত। শান্তির ঘুম ঘুমায় তখন।

৯.৪ গল্প হেকিমসাহেবের নামকরণ

সাহিত্য সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার নামকরণ। নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়। শিল্পসাহিত্যের বিষয়ের প্রবেশের চাবিকাঠি হল নামকরণ। কথাকারের জীবন জিজ্ঞাসা বা জীবনবোধ প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য রচনায়। নামকরণ সেই জীবনবোধের পরিচয় ব্যক্ত করে। পাঠক যখন কোনও গ্রন্থ পাঠ করতে বসেন, তখন কিছুটা কিছু কৌতূহল থেকেই তাঁর দৃষ্টি থাকে নামকরণের দিকে। ফলে সাহিত্যিককে যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতনভাবে তাঁর সাহিত্যের নামকরণ করতে হয়। সাহিত্যের সাহিত্যের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—নামকরণ যা নির্বাচন সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাকে প্রস্ফুটিত করে। এই অভিমত সাহিত্যের যে কোনও শাখা প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নিশ্চয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিশেষ চরিত্র বা স্থাননাম অনুযায়ী নামকরণ করার রীতিও প্রচলিত। বাংলার সিরাজের 'অলীক', 'মেঘলার জোয়ার', 'আমি রক্ত বলছি', 'আলকাপের পুরুষরা', 'সিন্ধু ঘাটাছের মেঘ', 'কর্ণেল শিকদারী', 'সেই মৃত্যুরা', 'তুমি এ সমাজ মৌচিকার', 'তন্ময়কুমার', 'কালো অনুভব', 'অনন্তবর্ষা কোথায়পাড়া' ইত্যাদি সাহিত্যগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যে সাহিত্যগুলি নামকরণে চরিত্রনাম বা স্থাননাম প্রাধান্য পেয়েছে। আবার 'নরক গুলজার', 'কালবেলার বধূ', 'বন্দিনী', 'তরঙ্গিণী', 'গোধূলিবেলা', 'উপন্যাস', 'হয়তো প্রণয়', 'সকালের রাগিণী' ইত্যাদি সাহিত্যগুলির নামকরণ অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবাহী।

আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, বাংলার সিরাজের 'গল্প হেকিমসাহেবের' সাহিত্যের নামকরণ কোন রীতি মেনে করা হয়েছে। লক্ষণীয়, সাহিত্যের নাম 'গল্প হেকিমসাহেবের', 'হেকিমসাহেবের গল্প' নয়।

অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দপূর্ণ। নিছক একজন হেকিমসাহেবের জীবনকাহিনি নয় বলে লেখিকাকে ধিক্কারও দেয়। এ লেখিকা লেখার শেষদিকে কাহিনি সম্পর্কে তাঁদের মতামত নিয়ে আমাদের জানিয়েছেন :

'অথচ লিখতে লিখতে প্রবীণ আত্মজের চিকিৎসকবন্ধু আমুর্তদেবতার জীবনকথা নিয়ে। অনেক দূর এগিয়ে গেছলাম, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। লেখা ফেলে চলে গেছলাম বাংলাদেশে। বাংলাদেশ মুক্ত হিয়েছিল বেরাজেশনের অসমাপ্ত অমুদ লাহিড়ীসাহেবের কর্মশিবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে।

সেখান থেকে ফিরেও হেকিমি চিকিৎসাবিধির ওপর বইটি পড়েছিলাম অনেক। গাছ, লতাপাতা, পোকামাকড় আর পশুপাখীর হাড় কলজে জলে ফুটিয়ে লাখলাখ প্রতিষেধ নিয়ে লেখা বইটিতে দেখি—রক্তচোলাদের পালটি খেয়ে কুর্তাজাতির নিরাময় ঘটে। আরো দীর্ঘ তালিকায় উপকরণের সঙ্গে রক্তচোলাদ জ্বাল দিয়ে মালিশ মালসায় সেই তরল পদার্থ ঢেলে পেটে রাখতে হবে রোগা আকাশের নিচে, জোৎস্না রাতে। রাতজোড়া জোৎস্নার আলো খাবে পাখরাটি, খাবে রাতের দেহের যা শিশির। লোকা যায়, হেকিমের পাখরাটি তৈরির পদ্ধতি যেমন জটিলও তেমনি এই পাখরাটি দুর্লভ দুর্মূল্য। অনেকে নিজের এই গবেষণার জেলীয় প্রমিত হেকিম আজকের মানুষ নয়। সেড়শো বছর আগেকার মানুষ। এই গবেষক পুরু যখন দীর্ঘি, সন, নিজেকবাদ হেকিমের খাতির মহাপদমে, সেল তার বৃদ্ধত্বে। মাঝে তার অসাধারণ জনপ্রিয়তার ঈর্ষান্বিত পাদলহেলী (ওয়ালী খাঁ ও পশুপাখি সোকার)। ফুলজাতি, বনি-বাজার যত যে তমুদ, ইউনানী চিকিৎসার সরঞ্জাম দুষ্প্রা তৈরি করলে এমন রোগ সারাবার উপায় থাকে। এই অমুদ তৈরি করার অনুষ্ঠী উপকরণ রক্তচোলাদ। এছাড়াও এক দুষ্প্রাপ্যের ঘাটতি অমুদ আধিকারের জন্য প্রয়োজন রক্তচোলাদ। অর্থাৎ রক্তচোলাদ শক্তি ও সঞ্জীবনীর প্রতীক। যুবক ও যৌনতার প্রতীক। লাহাড়া পাখার ডেলে হেকিম পাঁচে পাচ্ছে জোগী খুঁজে বেড়াচ্ছে। খা-পাঞ্জুর ছিল রোগের খোঁয়াড়। রোগের রাজা তখন ইয়েরেক্স, ইয়েরেক্সের প্রেমা আদিমার, আদিমারের আদিমারক আমুকলার, অক্ষীজলার পাখলিমার জিকাপাখী আশাপাতের সাদার মধ্যপ্রাচ্যেরী মুক্তর রোগল পাচ্ছে। মানুষ মরছে মমুক, তারের চাই পাচ্ছে। ফলে ঘুর-আরি-বীলকলি-চক্ষুশীড়া-বক্ষরোগের মত রোগেরাই লাখলাখি নিত হেকিম। নিমে হেকিমের দিন কাটছে রোগী খুঁজে পাখরাটি দেখাবার পাচ্ছে। আর রাতে পালাচ্ছে পাখরাটি। হেকিমের পাখরাটি ফুলের মুরভি খায়, ফলের রোদের খায়, মধু খায়, ঘৃতলাদি খায়, ঘাসের সবুজ খায়, রাতজোর একটিনা জোৎস্না খায়, শীতল পাচ্ছাদ খায়। আরেক ফুধা তার। আসমানের কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিও খায়। পাখরাটি-এর যেমন শক্তি চাই, সৌন্দর্য চাই। চাই বিশ্বস, চাই রোশনাই। কিন্তু পাখরাটি-এর প্রধান উপকরণ রক্তচোলাদ চলে যায় মহিরাপদ্মের জোয়ারনাদি-এর সন্ধানে। তরাদি খাঁদের মহিষের খুবই পছন্দ রক্তচোলাদ। আসলে পলাশপুরের আমুকলার পশুপাখি সোকারের খাতিরী জোরে। তালাদি করে সে জোয়ারমহিষ পাঠিয়ে দিয়েছে মহিরাপদ্মে। সে হেকিমকে এমন বিপদে ফেলবে আগে হেকিম ভাবে পলাশপুরে। সে কারণেই জোয়ার প্রথম যে কাজটি করে, তা হলো হেকিমের পাখরাটি আধিয়ারের পদ্ধতে বন্ধ করে রেখ। দুই রক্তচোষ আমুকলারের সাদার খুঁটি হয়ে যায় সহজ, সরল, সুন্দর আমুর হেকিম। হেকিমসাহেব সন্ধানে যে চলে আসে পশুপাখি সোকারের আমুতে। সেখানেও আর কপালে জোটে অপমান,

নদি। মঞ্চোপকরণের অভাবে মুক্তাঙ্গনের অভিনয় সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না। অনুষ্ঠানে থাকত গান আর আঙ্গিকের মহড়াটুকু দেখা পুঁথি, কিন্তু কখন দেখা যেত্তে বসিয়া। মাঝে মাঝে শ্রোতারা কখন জিজ্ঞাসিতে খুশিমত পড়ছে। খুড়ো হাতের আর গলাখানি নিয়ে থাকে শ্রেক্ষিমতে। মুক্তাঙ্গনে উপস্থাপন করে শ্রেক্ষিমের অনুকূল তৈরি করার অপরীক্ষায়। শ্রেক্ষাগৃহে নাটক আপেক্ষাকৃত পরিণতকে তুলে ধরার অনেকটি এ নাটিক দেখা হয় না। এ নাটিক ইতিহাস ও কালের সীমা শ্রেণীয়ে চলে আসে বর্তমান সময়ে। মুক্তকণ্ঠ প্রযোজিকা 'পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেব' নাটিকের প্রথম পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল। '...পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেব আটি কখনোটি পঞ্চকন্যা বা শ্রেক্ষিম সাহেবের জীবনগাথা নয়, বরং আমাদের অতি চেনা অবচেতন মিছুর এক আত্মকথা।' মুক্তকণ্ঠের নাটির সঙ্গে অনুভাব সমস্যার সোপান করি। আজ আমাদের এক অতি চেনা অবচেতন মিছুর কাছাকাছি নামানো এসে হাজির হয়েছি। শ্রেক্ষিমের মতো অনেক বিশেষজ্ঞটি মুক্তাঙ্গনের নাটির উপস্থাপনের কাছাকাছি সাধারণ উপলব্ধি পাচ্ছ না। উপলব্ধি যোগাযোগ অভিজ্ঞতের নিজেদের অর্থ খোঁজে, পরীক্ষাসমূহ পরিচয়ে অন্ধ হয়ে ওঠে। প্রাক্ষ বিশেষজ্ঞের বল লালসার শিকার হয়। অপেক্ষ পরিচ্ছ সরকার যথার্থটি বলেছেন—'আজ থেকে শেকৃপেয় বছর আগেকার এক শ্রেক্ষিমের পঞ্চকে তিনি এমন এক মূলধনের অর্থ বিয়েছেন যা ঐতিহাসিকতার পরিধি ছিন্নিয়ে এসে আমাদের জিনগাণিতের এলোমেলো সমস্যার মধ্যে চুকে পড়ে এবং মুক্তাঙ্গনে পরিস্থিতি ও পোষাক-আশাকের আড়াল থেকে আজকের নিজের চৈতন্যিকতার একটা বড় অংশ এ নাটিকে আয়নার দিকে নিক্ষিপ্ত হয়।' ['আজকাল পত্রিকা', ০১.০৬.১৯৯৩]

এ নাটিকের নামকরণে আছে আরটি ইঙ্গিত। খুব সকালবেলাটেই নাটিকার এ নাটিকের নাম নিয়েছেন 'পঞ্চ শ্রেক্ষিমসাহেব'। পঞ্চ মানে অবশ্যটিকে নাটিকার শ্রেক্ষিমের পঞ্চকে মিলিয়ে নেন প্রচীন কালের সঙ্গে আজকের জিনসত্তা সমন্বয়ে। পঞ্চ মানে তাৎপর্যটিও বাদুন। শ্রেক্ষাগৃহে নাটকের শুরুতে কথককে নিয়ে গান পরিয়ে পরিয়ে প্রবেশ করে এক কলিয়। তার হাতে জ্বলন্ত টিয়াগ। কলিয়ের কথাটি পাতলের মধ্যেটি লেগ হয় নাটিকের কথাটি শুন্য। সব পঞ্চ সম্পূর্ণ হলে সে জ্বলন্ত টিয়াগটি নাটিয়ে আনে কথকের জিনয়ে। কলিয় এ নাটিকে সূত্রধর, কথক ও বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেছে। সব মূলেটি তার উপস্থিতি নেই। প্রথম অঙ্কের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম মূলে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ ও পঞ্চম মূলে সরাসরি তাকে দেখা যায়। অন্যান্য মূলে সে চলে যায় নাটিকের অন্তরালে। তার কুলি থেকে সে বের করে এনেছে শ্রেক্ষিম সাহেবের পঞ্চ। যে শ্রেক্ষিম সাহেবরা ইতিমধ্যেই পরিচ্ছ অবটি বর্তমানে নিজুটি প্রজাতি। অনুভব উপস্থ সমাজে পাশাপাশি পাশাপাশি যে বাস করে তারা শ্রেক্ষিমের পঞ্চ। জন্মে ওঠে সেই পঞ্চ। যে পঞ্চের আগমনে আছে সোনাজাদের কান্নী। কলিয় কখনও নাটিকের মাঝে সূত্র পরিয়ে নিয়েছেন, কখনও বা নাটিকারের পঞ্চকাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানে ও প্রকাশের সেতু নির্মাণ করেছেন তিনি। তার পঞ্চের শ্রেক্ষে সবচে শ্রেক্ষিম। শ্রেক্ষিমকে নিয়েই তার পঞ্চের শুরু, বিস্তার ও শেষ। পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেবের কিন্তু পঞ্চ হলেও তা পরিচ্ছ। ত্রিকরণ সমবায়েটি তুলে ধরে এ পঞ্চ। এ পঞ্চ মুক্তাঙ্গনের মঞ্চ সমস্যাটি মিলিয়ে যায়ন। যদ্য, মনের জোরে যেটি জোরে। শ্রেক্ষিম সাহেবের পঞ্চ যে শেষ হয়েও শেষ হয়না। তারা মনেও মনে না। যেঁচে থাকে মানুষের মনে, মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায়। এ শ্রেক্ষিম সাধারণ। একজন প্রাকৃতিক চিকিৎসক নয়। সে চিকিৎসা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, নিয়া নতুন অভিজ্ঞতে যোগ করে। মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে। ফলে জীবিতকালেটি তাঁরা

বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। ফলে তার এ ধরনের 'গল্প হেকিম সাহেব' খুবই সফল ও সার্থক। আবেগপূর্ণ বক্তব্যধর্মী ও গভীর অর্থবহ এই গল্পগুলো। এ গল্পগুলো কেরামতির হাকিমের মাধ্যমেরূপায়ণ হয়েছে। কিন্তু 'গল্প' শব্দটি ছুড়ে দিয়ে লেখকের অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা এনেছেন। সবেদল মিয়ের 'গল্প হেকিম সাহেব' লেখকের কেরামতি চরিত্র হেকিম। এক নিখাদ পরিহাসপ্রিয় আদুর হেকিম। কেরামত গল্পে আদের আদুর হেকিম আর ইন্দিলুইয়ে লাগিয়ে অবশ্যই বিদ্যুৎ চমকিয়ে। সে সময় দেশের রাজা ছিল ইংরেজ, ইংরেজের চেলা ছিল জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক ছিল আদুকবার, কবিরাজরা, পাঠশালার ও মহাজনকোটি। তারা খাজনা ছাড়া আর কিছু বুঝতো না। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার মনসিকতা ছিল না। ফলে পী-গঞ্জ ছিল রোগের সোঁয়াড়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সিলেজ্বর, টাইফয়েড, বসন্ত, সোনগাঁড়ুয়া ইত্যাদি রোগের বাস ছিল আদুদের ঘরে ঘরে। সে সময় হেকিম তার আলমের সহায়ে গায়ে হেকিমি সিটে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। খুঁজে বেড়াত রোগী। হাঁক দিত 'কবরাজি চরি সো...সবরাজি...জ্বরজারি হাঁপানি চক্ষুপীড়া বক্ষরোগ সর্দিরোগের সবরাজি পাবে সো...সোজাসুজা সব ভালো আছে সো।' রোজগের ভালো রাখার জন্য, মূল্য রাখার জন্য সে নিয়মিত পরিশ্রম করতো। নিত্য নতুন কবরাজি আবিষ্কারে নিপুন ছিল। ঘাকলবাদী হেকিমের পরীক্ষাটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। ঘাটো গাজরাজা, লম্বা ডোলা আলু, আদার গাঁড়া চুলি পরতো হেকিম। আর হাতে থাকতো আদুদের পাগিয়া, কাঁধে সেলিমেলি বস্তা। বস্তাটি মোটির সিটে থাকে। রোগের লোকেরা চিকিৎসার নিমিত্তে চাল, ডাল, কলা, সেদুল, মুলো, ডিম যা দেয়, তাতেই হেকিম সন্তুষ্ট। কারণ হেকিম জানে রোগের লোকের থাকবা ভোটে না, তারা হেকিমকে আর কি দেবে? হেকিমের পাঞ্জায় পড়ে তারা চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়। দিনান্তে হেকিম ফিরে আসে নিজের কুটিরে। রাতে তৈরি করে কবরাজি। আর আদুদ তৈরি করতে তার সেবকের সঙ্গে চলে রক্তপোলাপের লালড়ি। আর কবরাজি তৈরির লক্ষণিক অধিনায়। সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে রাতভোর চাঁদের জোসনা খাওয়াতে হবে। তার সঙ্গে পীচল বাতাস, ঘুমের ঘুমটি, মধু, ঘৃতলতি ও বিদ্যুতের ঝলমলি। আদুদে লাগবে ঘুমন্ত, রক্তদল জরিমুল। আদুদ বানাতে গিয়ে সে কোনও কীচক রাখে না, কীটি লক্ষন করে না। আর আদুদ তৈরি করতে সহায়তা করে বাসনি বাই, অতুল আকাশের পাই গঙ্গাবাসি। তাকে সে তার পাথর চাল-ডালের অর্থেকের বেশি দিয়ে দেয়। আর চরিত্রে উপস্থাপনা লক্ষণ পায় এখানে। অবশ্য শেষ করে সে গঙ্গাবন্দিতে, তারপরনে বৃদ্ধ চিকিৎসি হয়েছেন। গঙ্গাবন্দি মোটির ঘাল ফুলে ফেলে হেকিম তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু পরবর্তে ঘুমন্ত রক্তপোলাপের পাপড়ি না দেওয়াই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে সে কোনও আপোষ করে না। হেকিম ঘাল করে পরিহাসপ্রিয়, তারপি খী-র আদুকবারের অধীনে। তার সঙ্গে রয়েছে মোহাম্মদি গলাগলুয়ের আদুকবার পলুপটি সোমবারের। হেকিমটি পরিহাসপ্রিয় আর গলাগলুয়ের মালক ঘাড়িয়ে নিয়েছে অনেকখানি। হেকিমের অবর্তমানে গলাগলুয় জনরাতপ্রার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই অবশ্য করে পলুপটি মোহাম্মদিকে পরিহাসপ্রিয় পরীক্ষেয়ে যাতে রক্তপোলাপ আবিষ্কিতে হেকিমের কবরাজি বানানোর লক্ষ্যকিতে আমাদের ঘরীয়ো যায়। মোহাম্মদ পরিহাসপ্রিয় না দিয়েই পোলাপ আনিয়া দেখানে যায়। পোলাপের অবর্তমানে হেকিম ছুটে আসে তারপি খী-র কাছে। তারপির মায়ের চর্মুকি হেকিমকে পাঞ্জাবর্ণ দেয়, পোলাপের পরশে পীসা ঘুম বাবহার করতে। তারপি প্রতিশ্রুতি দেয়, এই ছেলাপের জন্য আলাপনি

পারবে না। ফ্রেডিক ফোনে দিয়ে বলে, যান তাড়াতাড়ি করবেন তো—দুই মিনিট, তারপরে তারা সে কথা রাখে না। নিজের বিবেকের কাছে সে খাঁটি থাকতে চায়—'আমি তো অন্যায় দাবিটাই আমার নিজের মন।' ফোনালাপটি দুজন ফ্রেডিকের মতো নিরেটমাল মানুষ পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

ফ্রেডিকের ফোন করে ওয়ালি খাঁ ও মধুমতি সোপারের বিরোধ মিটমাট করতে আসে। ফ্রেডিকদের পলাশপুরে নিয়ে আসার জন্য মধুমতি কারখানা লরিটাকে মোহরকান্দিতে। ফ্রেডিক যাবে ওয়ালির আমন্ত্রণে অবশ্যই মনে করিয়ে দেয় তার ভাইপো মোহর এক মাসের পরিকল্পনা করে। সে তার জিম সেরে মুখ ধুয়ে মধু নিতে আসে ফ্রেডিকের কাছে। ডিনিসার অধিক ফ্রেডিক মোশী মোহরী ফোন টিপতে পারে। সে মোহরকে দেখেই বুঝে যায়, এক ফালাকক যাবি বাসা বেঁধেছে মোহরের শরীরে। মোহরের লক্ষণ যাচাই করার জন্য মোহরকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজের রোগ স্বীকারে চায়। ফ্রেডিক মোহরকে বলে, 'ডিনিসারকেও দেখেছি, যাদের দাঁত রোগ হয়েছে তার দেখার কিছুই হয় নাই। যাদের দেখেন যাবি নাই...তারাই করে আইসাই।' মোহরের পীড়াপীড়িতে ফ্রেডিক বিড়ালের মধুর দেয় টিনটি, কিন্তু মোহরের যাবি নিয়ে চল উদ্বিগ্ন হয়। মধুর আকস্মাতার কারণটেও সে সন্দানকারে নিয়মনীতি মেনে চলার পক্ষপাতি। যাবি ফুল্লু মুরাদকে একবার মধুর খাওয়াতে হয় না তা ফ্রেডিকের কাছে জানতে চাইলে সে বিরক্ত হয়। সে বলে—'মোটা না খাওয়ালেও হয়।' ফ্রেডিকের মধুর মুখে মিশিয়ে বিড়িকে খাওয়াতে হয়ে। এই সুযোগে মোহর মুখে দিল মিশিয়ে মুরাদকে মেরে ফেলে। সমস্ত ফোন রাখলো হয় ফ্রেডিকের ওপর। তার মধুর খেয়েই মুরা মরেছে। মোহর পোলান অভিযোগ করে ফ্রেডিক মুরাদকে মেরে অভিশাপ দিয়েছে—এমন অপবাদের হাতে দেওয়া হয়। ফ্রেডিকদের মোহরে বাড়ি টেনে নিয়ে যেতে ওয়ালি খাঁ-র উদ্যোক্তারায় নিয়ে আসে হয়। ফ্রেডিকের দৃঢ় বিশ্বাস, তার মধুর মেরে মুরা মরতে পারে না। সে নিজেই সেই মধুর মেরে প্রমাণ দেয়—মধুতে দিল মেরি। এক্ষেত্রে তার উপস্থিত বুদ্ধির অতিরিক্ত করতে হয়। পাশাপাশি সে মধুপান করে, মুরাদই কিছু ছিল। মুখ পরীক্ষা করা হোক। এমনকে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। ওয়ালি আর শাবি মুরুল করে মোহরের বাড়ি খোলার আয়োজন নেয়। মোহরের বাড়ি খোলা হয়ে বাহিরে জড়ো হওয়া জনতা আমনে ফেটে পড়ে। ফ্রেডিকের এই অনভিজ্ঞতায় বিস্মিত হয় ওয়ালি। তার থেকে তার একজন সাধারণ প্রজা মধুমতির সম্রাজ্ঞের ধনি হয়ে উঠেছে তা সহ্য করতে পারে না ওয়ালি। সে ফ্রেডিকদের মুরোর দেখি করে, পাশ করে মোহরখানি-এর সাহসের সাথে সাহস বন্ধ দিয়ে। নিরাপত্তার ফ্রেডিক সব আলমারি, শাবি মেরে নেয়। নিরাপত্তিকারে সাধারণ মানুষের সেবা করে সে নেপ বলবাম, নেপ মানবিক পীড়ন।

সহজ, নীতিনৈতিকতা ও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফ্রেডিক সাহেব। মানবিকতার কারণেই সে মোহরকে শীতলপাটি বিছিয়ে দেয় বলতে, যে মোহর তাকে মুরার হত্যার জন্য দায়ী করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, সকলের সামনে হেয় করেছে, সেই মোহর যখন ডিনিসার জন্য তার সাহায্য হয়েছে, তখন সে অতীতের কথা ভুলে গেছে। মোহরের যাবি সাময়ারী হয়ে উঠেছে। তার চিকিৎসা করতে উদ্যোগী হয়েছে। কারণ মোহরের অন্য কোনও পরিচয় তখন তার কাছে নেই। মোহরের পরিচয় তার রোগী, তার সেবা পেতে এসেছে। মোহর মানবিকতাকে ফ্রেডিক সাহেব তাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'পরিশ্রমেরা সব জোপেরাই রোগিবিশেষ আছে, আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার ডিগ্রিতের চেয়ে একটি মানবিক সফলতা

কখনো বেশি হতে পারে না বটে। এই সমুদ্র পাহপালা কেন ডোহরের মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার এতে কটি পীরমুহুর আকব বেশি, এ কথাতে হয়।' সিপাহির মতি পরীর আশা আছে ডেহিমের, নিশান আছে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর। রোগী দেখার আগাতে ডেহিমের আছে শত্রু নিয় ডোর নেই। তার তখন ও তখন শত্রু ডোগ। তার বিদুশেষই সে নিরাময় করতেই কতে পেরেছে। ডৌলদী তাকে পরিত্রাণপত্র ছেড়ে পলাশপুরে যেতে বলেছে, সন্তানেরদাদের জন্য, ডোমার তাকে সত্যেরিক কতেছে পলাশপুরে যেতে। কয়দিন ছুটের দেরি দেখে, ডোন ডাক্তারি ডোদের সে পরিত্রাণপত্র ছেড়ে যায়নি। কয়দি তাকে পরিবেহছে পলাশপুরে গেলে তাকে এখন আসতে, যাকে সে আর ফিরে দীড়াতে না পারে। ডেহিম সেদিন কয়দিনকে বলেছিল—'দুষ্কুর যা বলে, তাকুরোলাল যা দেখে আমার তাতি আমা ডোদেরে ডিকেই, কিন্তু...পরিত্রাণপত্র ছেড়ে যাবার কথা কখনো তাবি নাই।' পরিত্রাণপত্র ছেড়ে পলাশপুরে এসেছে। নিজের ডোদের বিদেশ প্রাপ্তির আশায় নিজে নিজের উন্নতির জন্য নয়। সে এসেছে তার রোগীর জন্য ডমুদ নিয়ে। একটি রোগের সন্ধানে, তার সত্যতাই পরীক্ষা করার জন্য। মোহাবাদি তার কাছে দীকার করেছে সে পলাশপুরের চর। তবু কেন সে মোহরদাদি-এর দৌড়ে পলাশপুরে এসেছে তা জানতে চাইলে ডেহিম বলে—'আগলে সেই হল যা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমি পলাশপুরে আগতের জন্য আসি নাই, এসেছি একটি রোগের খোঁজে। আমার সত্যতাটি পাবার জন্য।' দুটি-ডোহরার বন্ধ হবার আগপ্রায় মোহর তার রোগটি ডেপে ধরতে চায়। ডেহিম তা ডেপে নিতে পারে না। আগতিনিদে রোগটি অন্যান্য আসার মেতে। মোহরের শরীরে দেখা দেবে বিস্ফোট। যে সাক্রামক রোগটি পরিত্রাণপত্র বা পলাশপুরে নেই, তাকে ছড়াতে দেবে না ডেহিম। চিকিৎসক হিসেবে তার এই দৃঢ়তা আমাদের মুগ্ধ করে। মোহরকে আশ্বস্ত করে ডেহিম বলে—'পরিত্রাণের আগতে সুস্থ হয়ে ফিরুন ডের গানপাজনা করবেন। মোহরদারের দেশায় এই ভয়ানক যাবি দুকিয়ে গজাতে দেশা মোনো আতের কথা নয়। আমার ধনার তারণ হাবেন পরিত্রাণের।' পরম যত্নে অমুদ তুলে দেন মোহরের হাতে। তার সেই মুতেই আশিনা পড়ে যায় পশুপতির আমুতে। পলাশপুর ছাড়ার আগে মোহর ডেহিমকে দীকৃতি দিয়ে যায়। ডেহিম পলাশপুরে থাকতে সাধারণ মানুষের তালো হয়ে—একথা জানিয়ে যায় পশুপতিকে। পশুপতির এক মাসের জন্য পালের অনুমোদন ডেহিম ডেলতে পারে না। এক মাসের আয়গায় ডোগে যায় দুই বছর। দুটি দীর্ঘমিয়াদ, কিন্তুসাধিতে। অমুদ মানুষের চিকিৎসার জন্য, তাদের সত্যতাই দেবার জন্য। সাধারণ মানুষের আগাধ্যন্ত সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছে ডেহিম। মুতুরে পশুপতি তানুকুলাচরণ তার কর্তব্য পালন করছে না। পলাশপুরের রোগীদের নিয়ে তার নিলাম করিতে লাগলো। ফলে পশুপতি ডোগারোগের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে ডেহিম। রাজা বিরোধে উপজ ডেলবার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। সতোর পুজারী ডেহিম মিটিমি কটে বলে—'জি হাঁ। খাজনার দিকে, ইঁদিক থাকিলে...মুটি আরো পারে কি করে? আর খাজার পরিত্র যাবস্থা করা তো তানুকুলাচরেরই কাজ।' অর্থাৎ, রাজাদের দীঘি কাটিয়ে ও খাজনা বন্ধ করার আগে তো সে তো কোনক অপরাধ করেনি তা সে তোকাতে চেয়েছে। মুখী হখন তাকে বলে, পলাশপুরে তার আর মতলব নেই। শাল কথা আতোলাবাধি নতুন আক্রোশবানু এসে তোগে। ডেহিম এককোক চিকিৎসার সজা করা বলে। আক্রোশ ও তার মমুদ সম্পর্কে ডেহিমের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু আক্রোশের পরিত্র কর্তব্য নিয়ে সে অভিযোগ তোলে। আক্রোশ সে আগে, এদের সাধারণ মানুষ, পরীব মানুষ পরী মমুদ

মিনতে পারে না। তার মতে, 'ঘড়ি বস্তুটি যেন কেমন। সারাদিন ঘড়ি দেখে একদিন মরে...তার চেয়ে সে হাঁটে না।...একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে বিনে...একুশের পাতায় ঢলা। লোকে এমন আস্তাকুড়ে ঘড়ি ফেলে!' পশুপতির ঘড়ি হারা মন ছেলিমকে। কারণ ছেলিমের মনমতোয়ার পশুপতির মুখোশ খসে যাচ্ছে। ছেলে ছলে আসছে নিখুঁত ঘুণ। তাই সে ছেলিমকে আস্তাবলে খাস ঘড়ির কাছে লাগাতে বলেন। ছেলিম দীর্ঘ প্রতিবাদ করে ওঠেন। সে সরাসরি পশুপতিকে জানিয়ে দেয়, অন্যের জোকারে সে যদি ঘড়ে দিতে পারবে, কিন্তু সে কাজটা তার নয়, তা সে করতে পারবে না। তার বন্ধুর ছেলে ঘোরতর্ষি মারা গেছে পুলিশ এলপাতাড়ি সে প্রতিবাদ করে। মৃত্যুবাড়ির ঘড়ে, বলিদানের মতে নয়। তার মন ছেলের শেষবার জন্য তারা মিনতার আবার নিচ্ছে। ছেলিম সহজে মনে যাবার মানুষ নয়। মানুষ মারা যাবে আর সে বন্দী হয়ে থাকবে আস্তাবলে তা হতে পারে না। তাই সে ছুটে গেছে ঝিকলগাছি, কীর্তনিয়ার, বলতলে। মানুষের ছেলার মানুষের পাঁচশ ঘোরাচ্ছে। মানুষগুলোর নাড়ির হাত ছেড়েছে না ছেড়েছে, মাথা ছেড়েছে তবু সে ছেড়ে। অবশেষে পলাশপুরের ছেলিমই তাকে নৌকার তুলে পরিয়াগাঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

নাড়িকের মুখুজ্যে ছেলিমের শরীর ছিল খুবই মজবুত। দুই মানুষগুলোর অত্যাচার, নিশীড়নের পীড়াকালে নাড়ে আর লম্বালম্বি ছেলার আর চেহি। নাড়িকের ছেলে ছেলি, সে ছেলবাগানে ছেলবাগে ছেলবাগ টেনে টেনে লাল হলে। অড়িক গলায় কথা বলে। তাকে আর ছেলা মুশকিল। তার ছোড়া ছিটেকে আগলে ছেলেরে ছিনাথী ঘাছেন। ঘাছেন অভিমানের সুরে বলে, একদিন তার বক্ষ ছুড়ে ঘাছেন পলাশপুর। ছেলিম জানায়, একদিনের জন্যও সে ছোলেনি পরিয়াগাঞ্জের মানুষদের। আসলে তার মনমতোয় বর্ণনীর ছোটোবেলিক শিক্ষার আলম ছিল না। ছেলাদের ছোলের লৌক ছোড়েছে, ছেলাদেরই সে অভিক ছড়েছে ছোলির ছেলা করতে। গরীব, দুর্বল মানুষদের দুঃখ দুর্দশা মাথাতেই সে তার কাজ। মানুষের মঙ্গল করা, নড়োনখার করার মধ্যেই সে জীবনের মহোল্লাস খুঁজে ছেলেছে। ফলত, পলাশবনালী থানাদি বী কালাপাত্র ঘাবিতে আক্রান্ত হলে, পলাশবাসীরা অসম্মান ছেলিমের কাছে ঢিলটিক হয়। তার ছোড় ভাই ছেলিমের কাছে ঢীকনশিক্ষা ঘাছে। এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে ছেলিম আসর, তার অভিমান করা বন্ধুর সে পলাশপুরে ছেলে এসেছে। আসল ছেলাদরদের আস্তাকুড়ে ঘলেছে, ঘড়ি বন্ধুকে ছেলেন করা যাবে না। মুহূর্তি ছেলিমকে বলে, তারা মিথ্যা কথা বলেছে। তার বন্ধুর ছেলেই ছোরালটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। এ সংবাদে ছেলিম ঢীবন খুশি হয়। মনুন উদ্যমে সে থানাদি বী-কে ঢাঁচাতে চায়। আসার অভিমান করতে চায় বুদ্ধ ঘাড়ির বন্ধুর। কিন্তু বন্ধুর ঠিকির ঢালালী তার মনে পড়ে না। ঢালালী লেখা আছে সে আলমারির খুঁজিতে ছেটির সে খুঁজে পায় না। অগত্যা হাত যায় ছেলির। আরণ্য আসার ছেলি করে অভিমানের কি কি নিদর্শন ছিল। খুঁজি হাতড়িয়ে খুঁজে পায়—ছোরালা মালা, মুখলাদি, মালাজ, খুলোলেখা...। আসলে আর কিছু মনে পড়ে না আর। নিমেষে এক যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে সে। থানাদি বী আর বন্ধুকার আসুরে বি ছেলে ছেল আছে 'ছেলিমান' ঘলে। অভিমানে ফুলে ওঠে ছেলিম। রাগে, ছোভে, অভিমানে সে থানাদি বীকে আক্রমন করে। তার ভাষায় মনে পড়ে আসুরের মুলনি—'আসুরমান নামের আর অভিমানটি নড় নিজের মনে মনী করেন। ঐ অভিমানটির জন্য আমি আসুরে আসুরে আপনজনের পাশে আশা খুইয়েছি। একটি বন্ধুগুলোর জন্য আমি শত শত আসুরে ছেলেছি। অথচ অভিমানটির কথা কারো মনে পড়ে নাই। আজ নিজের পায়ে খুঁজিতে আমি

চলায় রেখিয়াম। যাব, আসেন, লাভরাই নাই...।' কারাটা কঠিন হলেও সহজ কথাকে সহজভাবে বলতেই অভ্যস্ত ছিলো রেকিন। রেকিনের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে, অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে সন্ধ্যামণি ও হারেম। তারাই রেকিনের অপূর্ণ তৈরি করার অঙ্গীকার করে দৃঢ় উচ্চারণে। অবশেষে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, শ্রান্ত রেকিন চলে পড়েছে চিরনিদ্রায়। নাটকের সমাপ্ত এখানে। এই মৃত্যুই সে হয়তো চেয়েছিল। মহাকালের নিয়মেই রেকিনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে বেঁচে আছে তার আবিষ্কারের মধ্যে। মার্কিনজা, গীর্জিটাগিজা, বিঠা, সাধনা, সাধারণের দুর্গ জাতীয় আমাদের রেকিন। রেকিনরা মরে না, মরতে পারে না। বরং তাদের মৃত্যু একটা বিস্তারণ চিহ্ন রেখে যায়। কেন রেকিনরা মরেও বেঁচে থাকে মানুষের মনে। মানুষের মুখে মুখে তাদের গল্প ছড়িয়ে পড়ে। কীর্তিকলাপেই তারা হয়ে ওঠে কিংবদন্তী। আজকের এই যোগসাধি, আর্দশের, আন্তর্জাতিক জগতে রেকিনদের তৈরি নেই। তারা আজ কুলকথার নায়কের মতো। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই বিরল ব্যক্তিত্বপূর্ণ রেকিনকে কবিদের মতো আমরাও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তার পুরনো কথাকে জেগে রাখি একটি প্রদীপ। যার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে রেকিনদাদের জীবনযুদ্ধ। সর্বোপরি, নাটকের ভাষা ধার করে বলা যায়, রেকিনদাদের জেনেছে গেলাম।

৯.৬ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

কয়ালি খাঁ : দুর্নীতিগ্রস্ত এক খল চরিত্র

'নক্স রেকিনদাদের' নাটকের দুর্নীতিগ্রস্ত খল চরিত্র নাম আমাদের কয়ালি খাঁ সাহেব। ব্যক্তিগতভাবে আনুকূল্যতার তিনি। বয়স সত্তরের বেশি। হাঁটতে পারে। হাঁটু কাজ করতে অসুবিধা হয়। শরীর তেলতেলে অশরীরে লেগে উঠেছে। তার সর্বাঙ্গে খুশি যেন মধুর হয়ে ঝিকিমিকি করছে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে বসতে চলাফেরা করে। এ যেন দুশ্চরিত্র কয়ালি খাঁ জগতের আলয়। জায়গার বাসিন্দার সঙ্গে ভূমি করার মানসিকতাও তার আছে। তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাহেব আমুদের আনুকূল্যতার নন্দলালি লোকজন। তাকে টেক্কা দেবার জন্য সে মরে যাচ্ছে। নন্দলালির সঙ্গে এক রিতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নন্দলালি একবার নেতৃত্ব দখলে সে পেয়েছে একবার বাজা। তাদের আসরের সম্মান, আবকারি রেখেছে সম্পূর্ণ আকারে। নন্দলালি তিনটে বিয়ে করায় সে করেছে চারটে শাদি। নন্দলালির ছোটোবিবি আছি। তাই সে এমন অভিনয় করি যাকে এনেছে যার বাপের বয়সই ষাটের। নন্দলালির সঙ্গে লাঠালাঠি, মারামারি, ঠোকাঠুকি না করলে তার ঘুম আসে না। কলকাতা চালাতে নতুন অনুষ্ঠানে সে নিয়োগ করেছে নানাধরনের খুন, জালিয়াতি, ছিনতাইয়ের মামলা সাজানোর জন্য। নন্দলালির বাঈজী যেন তার বাঁদিকে ছিনতাই করেও তার মনে শান্তি নেই। কারণ নানাধরনের সঙ্গে তার মারামারি হচ্ছে না। তাই নন্দলালিকে উত্তেজিত করার জন্য সে বাঈজীর লেখার আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখে। তার এই পত্র তার উদ্দেশ্য অসৎভাবেই পরিচয় দেয়। বাঈজীর মজলিসে থাকার জন্য তার লোলুপতা তার চরিত্রহীনতারই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, হাকিমের চাপরাশ ছড়ো, তোষা, চুমি আর আসরে সে সুসজ্জিত হয়, সুবাসিত হয়। তার ভোগলিপ্সা ও কামলালসার বিকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বাঈজী না পুরলে তার আনুকূল্যতার যে অভাব থাকে না সেকথার সাক্ষ্য সঙ্গে

বলে। পশুপতিকে সে প্রতিবেশিদের সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে নিজের একটা আশ্রয়ে নিয়ে এসেছে। তা বাদে প্রবীণ জনসাধারণের বিশিষ্টজনদের। তার আনুগত্যেই বাদ করে প্রেমিকের মতো পুরী চিকিৎসার। নিয়ে গড়ন অনুযায়ী আশ্রিতার করে আনুগত্যের সেবায় সে নিয়োজিত। পারলিক প্রেসের বা জনসাধারণের ব্যবস্থা পুরোই অনুকূল পশুপতির আনুকূল্যে। মুখুয়ার আক্রমণের আগে যার পরবর্তিক আক্রমণ। পরিস্থিতিতে এই সমস্যা নেই। এখানে প্রেমিক সাহেব আছে। সে সাক্ষাৎই নিয়ে ভোগ সাধারণ। এ কারণ প্রেমিক না করলে অবশ্যিত পাহারা বন্ধ হয়ে যাবে। পশুপতি মোহরকে পাঠায় পরিস্থিতিতে। মোহর পরিস্থিতিতে এসেই প্রেমিকের সাক্ষাৎই-এর প্রথম দিশাকরণ ব্রহ্মচোলাল পরনে নিয়ে যেয়। ব্রহ্মচোলাল পাওয়ার আশায় প্রেমিক ভিনদিকে হয় অবশ্যিত চৈতন্যধারায়। অবশ্যি তাকে সাদরে সম্ভাষণ করে। প্রেমিকের দেখে আশ্রমে আক্রান্তরা হয়ে পড়ে পড়ে—'...এসে এসো আমার সোজ প্রেমিক এসে...আমার এসে...আমার মেয়ে এসে।' প্রেমিকের 'আজের মানুষ' বর্ণটি মানুষ হিসেবে সে স্বীকৃতি যেয়। কারণ সে জানে, তার আনুকূল্যে সারাটী পীড়ে আশ্রমরক্ষা করে প্রেমিক। প্রেমিক আশ্রমের মুখ্য রাখে বলেই তার প্রাপ্য পাহারা তার যায় না। আনুকূল্যের হিসেবে রাজাবাটী কথা, পরমেশ্বরী কথা, আশ্রমিক সাক্ষাৎই কথা, পাহারা শাসিত জন্য অন্যান্য বিধি ভাঙিয়ে। ইত্যাদি ভোগের সাহিত্যেই সে পালন করে না। তার আনুকূল্যে ভোগ ব্রহ্মচোলাল সে চিন্তা করে না। প্রেমিক সে সহযোগে ভোগ ঠেকাবার জন্য। তাই প্রেমিকের প্রতি তার আনুগত্য বজায় রয়েছে। পরবর্ত প্রেমিকাকে অবশ্যিতে যাওয়ার কথা বললে, অবশ্যি বলে—'না মা ও তোমার যাবে।...এসব ঝোপঝাড় কাঁকরাতে ঢেঁপে ভোলে চলবে? আনুকূল্যে মরে এসব্যি প্রেমিক আমার। না মা, এসব অকাজের দিকে তুমি মোটে কিছুতে না যেয়ো।' অথচ প্রেমিক যখন বলে, ব্রহ্মচোলাল না খেলে তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে তখন সে নির্বিকার থাকে। ব্রহ্মচোলাল নষ্টিকে নিয়েই হয়ে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ভোলাল ছাড়াই প্রেমিক অবশ্যিই আসাকে পরাজয় যেয়। প্রয়োজনে ভোলালের পরনে পীতাম্বরী পাওয়ার পরতে বলেন। এ কথাটা শুনে প্রথমের আশ্বাস দেন। অবশ্যির পরে অবশ্যি ঘটনাচক্রে কাজ পরতে প্রেমিকাকে প্রয়োজিত করে। প্রেমিক নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মচোলালের জন্য পরাশস্যুরে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অবশ্যি ক্ষুব্ধ হন। প্রেমিকাকে ক্ষুব্ধি দিয়ে বলেন—'তার সাথে আমার কথিনদিন, তার বরিতার ফুলে হয়ে তোমার আধিকার।' আর এই সংলাপে কথনকারী পাওয়ার ব্রহ্মচক্ষুকে দেখে আমরা ঘাঁচতে ঘিটি।

এ নষ্টিকে অবশ্যি যাঁকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তোতাই তাকে বাক্তিত্বহীন, চেতনাবহীন পাওয়ার হিসেবেই দেখি। মোহরের, তোতানুসেরা তাকে নিয়ে আছে। ভোলাল মনোবৃত্তির আশ্রমেই কিনি সমস্তকিই তোলাও নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। পদ পদ তার পদ পদস্খলন। যে যা বলে তা সমস্তকিই বিশ্বাস করেন। প্রথম অংশের নিম্নোক্ত খুদ্রাংশ একটি মূর্তিক হিসেবে অবশ্যি চরিত্রের চালকক্ষ কিনটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

'মুক্তি : আজে তোলাল তোলাল আজ্ঞে কেন? পীতাম্বর নিয়ে আজ চলিয়ে যাব যে...

অবশ্যি : হাঁ, আমি যাব।

প্রেমিক : (মুক্তিকে) এটা কি অবশ্যি চালাতের ব্যাপার?

অবশ্যি : (প্রেমিকাকে মৃদু জবাব করে) না, না, এটা আজ চালাতের ব্যাপার নয় তা বলে।

ফ্রেডিক : আমাদের মতো মানুষের বাড়ি। পীরসাহেব হতে যা।

ওয়াসি : আহা না, হতে যা।

ফ্রেডিক : জগতের পাপে যদি আমারই হয় না, আর জন্য দোসুত পা-ই চাই।

ওয়াসি : (মুগ্ধদিকে) বীর, দোসুত পা-ই চাই।

মুগ্ধদি : আর যে দেশে দোসু নেই!

ওয়াসি : (মুগ্ধ সজল করে) বীর, সে দেশে দোসুই নাই।'

অর্থাৎ, কখনও মুগ্ধদির দিকে ঝুঁকেছে, কখনও বা ফ্রেডিকের কথায় সায় দিয়েছে। একপক্ষের সে কখনও মৌলবীর পক্ষ নিয়ে বলেছে, ফ্রেডিকের মতো আমারই তার সহানুভূতি। পরমুহূর্তেই মত বদল করে বলেছে, মুগ্ধদির মতো মহীয়সীর একজন পরিচারকের পা দিলেই সব জোর সেরে যাবে। মেহেরবানিয়ের বিবি মুখ ফুটে কোনও ওয়াসির আচার-ব্যবহারে আমরা বিরক্তিকর লক্ষ্য করি। মৌলবীর পরামর্শে সে ঠেঙিয়ে উঠে বলে, একটি মেয়ের নিয়ে এতো বাঁচাবেলের দরকার নেই। একটা মেয়েলের পেছনে যদি জোয়ান এক ছেলেপে পড়ে, তাহলে মজলিসে রব তাবলা করবে কখন? মেয়েলকে ঠেঙে বড়ি মেরে পাড়ে ফেলে আসার আবেগ বেশ পরিষ্কার। আবার মুগ্ধদি যখন আসে, মৌলবীর মতো একজন আর্দ্রিটেনের পরামর্শে কেন তিনি পুনরায়, তখন মৌলবীকে পাল্লা দিয়ে সরিয়ে মুগ্ধদিকে কাছে ডেকে নেন। পরক্ষণেই মুগ্ধদির উপর রাগও ঝেড়ে যায়। ফ্রেডিক কবুতে বিষ মিশিয়ে মুরাদকে মেরেছে—একথা সে বিশ্বাস করে না। ফ্রেডিকের নিজের কেন পরিচয় থাকলেও লুকিয়েছে তার ইতিহাস চায় মুগ্ধদির কাছে। ফ্রেডিকের মেজাজে বড়ি খাওয়া হয়েছে কেন তার কারণও চায়। বড়ি খেলার দুঃখের কেন। দুঃখ যখন আকে পরিয়েছে এই পর্যন্ত যে, পরিচারকের মত ফ্রেডিক থাকবে, সন্তুষ্ট থাকবে মোহরবানি। তখন ওয়াসি নিশ্চয়তার সুরে মুগ্ধদিকে বলে, 'এ তো বড়ই সাধারণিক মেয়েলের মেজে নিজের দুঃখ। ও মৌলবি, ফ্রেডিক কি বলি, মুরাদের কাছেই তো আসি ফিরতে পারব না। এখন এরা উভয়পক্ষে যদি মিলমিশ করে না থাকে, আমার পক্ষে তাদুক চালানোই মুশকিল।' ওয়াসির মো-মিলন যখন পরক্ষণেরকে তার আত্মবিশ্বাসেরই প্রকাশ করে।

ওয়াসি খাঁ এক মিষ্টুর শাসক। তার তাদুকে মেটে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তা সে মনেপ্রাণে চায় না। সকলকে সে নমিয়ে রাখতে চায়। পরিক্রমার চরিত্রার্থ করতে সে রক্তপোলাপ আটিয়ে ফ্রেডিকের অভিজ্ঞান বন্ধ করে দিয়েছে। রক্তপোলাপের জন্য তার পাছে মাথা ঝুঁইয়েও তার মুখর উঠেনি। উপরন্তু ফ্রেডিককে তাদুক মেরে শায়েস্তা করতে চেয়েছে। ফ্রেডিক পরিচারক ছেড়ে পলাশপুরে চলে যাওয়ার সংকল্প জানালে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়ার ছলে বলে তিনি পাঠিয়েছেন—'কিন্তু ফ্রেডিকি করেছ কি...বলেছ কি, এখন বাকলা তোর জন্মের আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।' ফ্রেডিকের অনিচ্ছায় সে ঘিনঘিনে হয়ে ওঠে। নিজে আকে নিয়ে করে তোলে। প্রথম আক্রমণ পরাস্ত মুগ্ধদা আমরা ওয়াসির মুখরহীন, দৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের পরিচয় পাই। মৌলবির মুক্তিকে মেনে নিয়ে ওয়াসি নিশ্চিন্তে আসে যে, মুরাদকে বিষ দিলে তোমরা, মুগ্ধদিরই নিয়েছে। মেহেরবান মহিলা মুত ফ্রেডিকের হাতে তুলে দিতে চলেছেন। ফ্রেডিকের মেজাজ মেজে বড়ি খেলার আবেগ

নিয়েছেন। যদি খোলা হলে হাঁটুতে হাতুড় ছেলিমের জারজনি করে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে ঘটে ওয়ালি। পাশবিক আক্রোশে খুন করে ছেলিমের জনয়। রাগে আরে কাছে ছেলে লাঠির শেষের দীকাগে মুক্তুটা ছেলিমের পেটে ঢেলে পরে যন্ত্রণা দেয়। তারপর ছেলিম মাটিতে পেলে নিষ্ঠুরভাবে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। চিৎ হাতুড় মতো দুপায়ে দিয়ে বলে—'ঈঁর জন্যই আমার ব্রত। আমার একটি ব্রতকে তাহি সাজা দিই, তাকে শেষ করে ফেলা ছোটো ছেলে। এতোবড় আলেমের কাছে হলো আমার এই প্রথমটি।' ছুরাকে মারার অভিযোগ চাপিয়ে দেয় ছেলিমের উপর। নিষ্ঠুরভাবে ছেলিম প্রকাশের শাস্ত করতে চাইলে ওয়ালির মাথার ভারা পড়েগলুন ছেড়ে যায়। ওয়ালি ভাবে পড়ে, তার অজুহাতে ছেলেটাই চলবে তার ছাত্রুক। অথচ ছেলিমের অনুরোধে লাঠারা শান্ত হয়। ওয়ালি এটা ভালভাবে করতে পারে না। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ছেলিমকে ছুরো পেটা করে। ছেলিমের মতো শীর্ণ পরলম্বকের গায়ে হাত দিতে সেই পৌলবির একথা শুনে পরক্ষণে ওয়ালি বলে—'আরে আমি, পরলম্বর যে রে! আমি যা ক। এ আলুকের অমার যে, আমি যা ও।' পৌলবির পালেও সে ছুরো মারে। অথচা হারাদের আক্রোশে সে আবার ছেলিমকে ছুরো মারতে পারে। ছেলিমকে শুধু শারীরিক আঘাতের কারণই সে মরে যায়নি। আরো আলাদা নির্যাতন করার জন্যই মারা করেছে মোহরালি-এ গায়ে মাকে থন দিয়ে। ঘৈয়ারাণী, একদরকারী পাশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ওয়ালি। মরিয় সে নিজেদের পক্ষপাত মোহরলালিকে কঠিন শাস্তিদান হাতে না—'খুশি তো খাবি, এবার খুশি হ' তোমু মেরে ছুরো মারার মধ্যেই সে ছেলিমের জন্য ফলফলটি পাঠায়। এ তার নির্লজ্জতার এক ভূত প্রকাশ। মোহরের মাটি তার একটা মানের ছিলটি। সে নিজের কানে শুনেছে মোহরের ঘীলতোক্তি—সে পলাশপুরের চর। অথচ সঙ্গে সে মোহরকে ফিরিয়ার করে লাঠির পেরা মেরে তাড়িয়ে দেয়। এক ঘটিকার মোহরের মা থেকে পরাণ ঘুলে যেত। পশুপতির কাছে এখানে তার চৈতিক পরাজয় ঘটে। পশুপতি যে ছলায় কথাই মোহরকে তার ভালুকে পাঠিয়েছে এ ব্যাপারে তার মনে খটিকা থাকলেও সে তা ধরতে পারেনি। মোহরের মাতৃত্বলাভে সে ছেলিমের উপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায়। এই অপরাধে বিন্দুমাত্র এক মহাপার শিকার হয় ওয়ালি। ছেলিম যেন তাকে মাটিতে মিশে, সেন করতেই পরিত্রাণপত্রে আছে বলে তার মনে হয়। অথচার মর্মে মাকে সে প্রতিমুহূর্তেই পরিচয় রাখতে চেয়েছিল, অপমান করেছিল, অবজ্ঞা করেছিল, আজ সে নিজেই অপমানিত বোধ করলো। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গেল ছেলিমের কাছে।

ওয়ালির জীবনের সবচেয়ে বিপত্তির দিক হল, লাঠিয়ের পেছে আছে লক্ষলালু হাতে হয় ছেলিমের কাছে। তখন সে কলাগাছ কাটিতে আছাড়। হাতে পায়ে শরম, সারা গায়ে শুকনো ঘা। শিক্ষাগুরু তাকে অবসর দিতে দিয়েছে। লাঠি খেলার কলাকৌশল শেখি। পরক্রমক লাঠির জন্য তাকে পাঠায়ছে, বলে, অন্যান্য গাছগুলে পরামর্শ দিয়েছে শিক্ষকগণ। কিন্তু আলুক ছেড়ে সে কিভাবে থাকবে? ছেড়ে তাহি ছুটি এসেছে ছেলিমের বাড়িতে। হাত জোড় করে কাতর স্বরে জীবন-ভিক্ষা চেয়েছে ছেলিমের কাছে— 'ছেলিম সেটা তুই আমাকে দীক্ষা।' সে তার অনুজ ছেলেন এসেছে পলাশপুরে। অনুজ চৈতিক প্রশাসনীয় সে ভুলে গেছে। প্রশাসী ভেবা ছিল সে তালগাছের পুঁথিতে সেটিও সে খুঁজে পাচ্ছে না। তখনই তার অন্তরাত্মায় আঘাত লাগে। পরক্ষণাত্মক হাতের তার পরাক্রম যে যায়নি তা বোঝা যায়, যখন সে বলে—'আমি তাহি ছাড়ব না ছাড়ি।

[illegible]

পশুপতি পোদ্দার : আর এক নিষ্ঠুর চরিত্র

[illegible]

করতে সে শিখছে মেয়ে, ফ্রেডিমকে সারা পড়ালিখা করতে হবে। তাকে মার খাওয়াতে হবে। তার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। কার্যক্ষেত্রে সে তাই করেছে। মেয়েকে নিয়ে ফ্রেডিমের বন্ধুদের জন্য উপলক্ষ পোলাও খাসির মিলেছে। মেয়েদের আসরের বিজ্ঞান বুদ্ধিকে মেয়ে মেয়ে-বন্ধু সেপ করিয়ে নিয়েছে ফ্রেডিমের উপর। ফ্রেডিমের বন্ধুরা সেটেই খুশী মারা পেয়ে আসে আরা আসরে করেছে। ফলে ফ্রেডিমের একদিকে সম্মান হয়েছে, অন্যদিকে অবাধিত অনুযোগটি পেয়ে হয়েছে, মেয়েদের পাশে থাকে বসে দিতে হয়েছে। এসব পশুপতির নিকট খুবি ভালো লাগে। সেই সাথে ফ্রেডিম শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষ হয়েছে। তার মোক্ষম চালে ঘায়েল হয়ে পড়েছে অবাধি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পশুপতি মধুমিতা আসে মধ্যেদের বিশ্ব ফ্রেডে দিয়েছেন, তাকে ঈশ্বরমিত করে তুলতে ফ্রেডেছেন এই বলে যে, ফ্রেডিম এখন পলাশপুর হয়ে আসছে। ফ্রেডিম সম্পর্কে সে তখন মিথ্যার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। ফ্রেডিমকে সে কত বিদেশ পলকলাড়ি, দিয়ে খুবি মেলে আছি, আসবাব, নানারকম গাছ আর একটি আছি মোড়া। মেয়ে বলে মধুমিতাকে খুশিয়ে মেয়। মধুমিতাকে বিস্মুল করে বলে—'মোলাকটি মেয়েদের আধুনিকতার ওপর বিশেষ মুগ্ধ। কী সব বলছিল, মোলাপমূল পাচ্ছে না, বমুল বানাতে পারছে না...কী সহি একটি আমিকার আসিছে আছে তার...।' ছাপার অক্ষরেই আমিকার করে পশুপতি। মধুমিতি অবাধমিত হয়ে চলে যায়। পশুপতি খুবি নিজেদের ভাবটি প্রতিপক্ষ অবাধিকে সাজানোমূল করতে মেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে সফলও হয়েছে। এই সফলতার পিছনে তার বুদ্ধিমি, উপস্থাপনা মধুমতী, দীর্ঘ বিস্মুল ও সূক্ষ্ম অবলোকন কাজ করেছে। অবাধি খী-র আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে সে অবশ্যই মেয় করলেও নিরুৎসাহিত হয়নি। বরং মুহূর্তেপলে সে পত্রবাহক মধুমিতাকে খুশিয়ে মেয়, আপ্যায়নিটিতে তার বিশেষ নজর আছে। তার মোটিভেশনটি ফোটোতে অলকারাম। বাসিন্দীনাড়ার অবন সে আপ্যায়ন করছে। আসের একজন আছ মোহা সে। পরমুহূর্তেই সে অবাধিত উচ্চেসের বিস্মুল-বল ছুঁড়ে মেয়—'আমার প্রতিবেশীর যে সাহীতে মন মেয়েছে, এটাই বড় কথা। তাঁর মত উচ্চমানীয় বিদুষী যেন সে অনেকদিন প্রতিবে আসর মেননি, এটাই বিস্ময়ের।' একপর্যায়ে সে মুদুস্বর মধুমতার মোমবাতী মতো মুখটিম মেয়। সেই মুখটিমে আর অহঙ্কার ও মূর্খতা যেন যৌথ হয়ে মেয় মেয় হয়ে আসে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ফ্রেডিমের সঙ্গে পশুপতির সাক্ষাৎ ঘটে। মেসমুহূর্তে পশুপতি ফ্রেডিমকে মেয়েই আন নজরের আসনে মুসলিল। আজ ফ্রেডিমকে কাছে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। নিজের বিরাট মোলাপমূলের কথা মতে সে ফ্রেডিমকে বশ করতে চায়। কিন্তু হতাশ হয়, যখন মেয়ে ফ্রেডিম মহিমাপন্ন ছেড়ে চলে আসেনি। সে এসেছে অনুশ্য মোহনের জন্য তার অভিজিৎ বন্ধুর নিয়ে। কিন্তু পশুপতি অবধারণে চলে যায়। কিছে আসে, যখন মোলাপন্ন মোহন ও মুগুলকে তাড়িয়ে মেয় মুখী ফ্রেডিমের কাছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—আজকের এক প্রীয়তে মোর মেয়ে পলাশপুরকে পীরাসনের জন্য। তারপরেই ফ্রেডিমকে এক মাসের জন্য পলাশপুরে মেয়ে যাবার প্রস্তাব মেয়। ফ্রেডিমের মন পলাশার জন্য এক মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে সে। ফলে, প্রথমবার গভীর রাতুপাড়ুলি মেয়েতে মারা যাচ্ছে শুনেও ফ্রেডিম চলে যাবে। ওরা কি এতটাই আঘাত তার কাছে। ফ্রেডিমের কাছে সে স্বীকার করে—'সত্যি মোহনকে পাবার জন্যে অনেক উৎপাত করিয়েছি আমরা।' পাশাপাশি একপাশ জানিয়ে মেয়, 'মন উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। যা করেছি আমার প্রয়োজনের মনাসনের জন্যে করেছি।' ফ্রেডিমকে সে অনুরোধ করে ফিরে আসতে

পরিচয় দিতে। আর সেদিনগুলি ফ্রেডিমকে বিশ্বাস করতে না পারার প্রতিক্রিয়াটি ছিল। এক্ষেত্রেও সে সফল হয়। ফ্রেডির থেকে যায় পশুপালপুরে। বিশ্ববিদ্যের একটি অংশ আর পুরণ হয়। অবশিষ্ট দীপকে চলার আমার শ্রেণী তার সফল হয়। এক যাত্রায় জন্য হলেও ফ্রেডিম তার আত্মীয়ে অনুভূতিকে জাগ্রত করতে পারবে—একথা ভেবে সে গভীর তৃপ্তি পায়।

এক বছর পরেই আমরা পশুপতির মুখোমুখি, কিন্তু তাহলেও মুখের পরিচয় নয়। শিরাদের মুখোশ নয়, হাজারো হিংসেরা তার মন লক্ষ্য করি। এক বছর আগে সে ফ্রেডিমকে পাগলপুরে পাঠানোর অনুরোধ করেনি আর অপমান করে তাড়িয়ে দিতে চায়। যার কাছে সে একদিন সকলকালু হয়ে ছিল, তাকে সে আজ লঘিষ্ঠ মানুষেরও নিচে করে না। তার খুড়তো বোনদের বাপটিই তুলে দিতে চেয়েছিল ফ্রেডিমকে, সেই ফ্রেডিমকে আর চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিয়ে তাকে আন্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে চায়। এমন কি ফ্রেডিম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য জানিয়ে দেয় যে, তার মনুষ্য মেয়ে-মেয়ের মায়া নেই। ফ্রেডিম আজ তার কাছে অপরাধী। কারণ ফ্রেডিম তাকে লাভুকলাল হিসেবে তার কর্মসংকর্ম সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছে। ফ্রেডিম তার আচরণ অমানুষ করে মেয়ীর সেবা করতে গেলে পশুপতির লঘিক আর হাত, পা ভেঙ্গে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়েছে। টৈরবাহারী শালকের বন্ধ আর অমরার আস্ফালন নিয়ে সে ফ্রেডিমকে ঘিরে ধরে রেখেছে। ফ্রেডিমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। লঘিকার মতোন ঘিন্ন সহজলভ্যতাকেই চরিত্রটির নাম দিয়েছেন পশুপতি। এক পাশব লঘির অধিকারী সে। মায়া জিনিষটি তুলো আর উপলব্ধি করে। এই অন্ধ সমাজের মতোই তার পশুপতিকে মুক্তার দিয়ে উঠেছে। বিশ্লেষণ করে, ফ্রেডিম প্রজাপতির তাদের লঘির সম্পর্কে সচেতন করছে—এ সমাজ শেষালের নয় তোর আর হিংস্র দীপ, সব তোর হয়ে আসছে। দীপ্ত খাবার প্রস্তাব করেছে ফ্রেডিমকে ফেড়ে নিয়েছে ফ্রেডিমের প্রাণ। এই নিষ্ঠাল, নিষ্ঠুর, মুখোশ চরিত্রটিকে লঘিকার সচিবকালেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পশুপতি ঃ সহজ ও মানসিকতার প্রতিমূর্তি

'পঞ্চ ' ফ্রেডিম সংবাদ' নাটকে পশুপতি চরিত্রটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেডিমে অবকে সাজানোর ভুল দিয়ে পশুপতিই উদ্যোগী হয়। ফ্রেডিম সাহেবের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার কঠিন লঘিত্ব সে নীরবে তুলে নেয়। ফ্রেডিমের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কাজটিকে অবে অবে পৌঁছে দিতে সে-ই এগিয়ে আসে। সরলতা ও মানসিকতার প্রতিমূর্তি সে। ফ্রেডিমের অবকে সে নিজের মতো অনিচ্ছা ফেলেছে। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে ছাত্রেছাত্রীকে, বৃদ্ধ ভিখারী ছাত্রেছাত্রীকে। ছাত্রেছাত্রের কল্পনা আর চিন্তাকে ছাড়া ফেলেছে। কাজের মাঝখানে অনিচ্ছে পৌঁছিয়ে আছে পশুপতি চরিত্রটি। লঘিকার মতোন ঘিন্ন সময় মতোন মতে তুলেছেন পশুপতিকে।

পশুপতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় সে জানোয়ের পটি। জানোয় অনুকূল সাপটির পটি, ঠাঁয়ারে অনুকূলের পটি। অনুকূলকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, কিন্তু তার চিত্তে, অন্তরালিক, অমানবিক মুলায়কে সে মেনে নিতে পারে না। অনুকূলের আদর্শিক জীবনকে সে ঘৃণা করে। তবু সে তার আদর্শে তার মুখে তুলতে তার আর মেতে থাকা হয়ে। আর মনে-'প্রী করুন, সেটি তো একটি না, সন্তানটি মনেছে। ঘৃণা হয়েছে, তবু

খেয়েছি। আর না... এর আর আর জীবন না।' এই সিদ্ধান্ত নেওয়াই সে কাজ নিয়েছে ফেব্রিকের বাড়িতে। ফেব্রিক মেয়েটার ইতিহাস জানে যা পড়ে তার সিদ্ধি আর গঙ্গাফড়িং লাগে। ফেব্রিক অবশ্য তাকে আর্থিক ক্ষতিই দেয়। পলাশপুরে একজন ঠ্যাঙাড়ে গোড়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে—এ সংবাদ শুনে গঙ্গাফড়িং আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। পাছে তাকুলের ফাঁসি হয়, গোরা পুলিশের পুলিশে তাকুল মারা যায়-এসব চিন্তায় সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাকুলের নিশানের কথা জানতে নিয়ে সে মেয়ের জন্য ধান কাটতে ভুলে যায়, ভুলে যায় ফেব্রিকের কথাগুলি শালবনে ঘুঘুরাতে প্রথম উপলব্ধন রক্তপোলাপ দিতে। ফলে সে ফেব্রিকের স্নেহের শিকার হয়। কারণটি ঠৈরি করতে তার নিজের আবার আছে-ফেব্রিকের এই অধিকারবোধকে সে অবশ্য স্বীকার করে না। অধিকারের আর প্রশ্ন আসে আগে ভাল-কাল-ভিত্তি-সবকিছু সব ফেলে সে চলে যায়।

গঙ্গাফড়িং গ্রামের সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষ। কিন্তু জীবনের নানা অভিঘাতে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে সহজেই বুঝে যায় যে, ফাজিল বৌ আর পশুপতি সোনারের প্রেমাভিনয়ে নামার মূর্তি হিসেবে যাকে যে হাতেই তার স্বামী তাকুল। মরিয়াপঞ্চ মা পলাশপুরে তার স্বামী ঠ্যাঙাড়েগিরি করতে — সেটাই সকলে বিশ্বাস করছে বলে তাকে কেউ সন্দেহ করছে না। নদুকুলুপ ছাড়ানোর কাজে তাকে মনের জোর টিপ্‌পে দেয় প্রসঙ্গে—'কত ডাকাতি দেখে দেখো না। একটা ঠ্যাঙাড়ে, সে পলাশপুর না মরিয়াপঞ্চে মধুপুর ঠ্যাঙাড়ে — সেটাই হচ্ছে তোমাদের পক্ষপাতের বিচার।' দেখা যায়, গঙ্গাফড়িং প্রতিটি কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাকুলের দুর্ব্যবহারে সে দুঃখ করলেও তাকুলকে ঘৃণা করে না। বরং স্বামীর প্রতি তার আরও ভালোবাসা আছে। তাকুলের নিশানই সে তাকুলকে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে ঠকেছে। তাকুল তাকে ভুল বুঝিয়েছে। তাকে বলেছে সে আসলটি ছেড়ে দিয়েছে। আর সে ফুঁয়ে দিয়ে কয়েছে, সে আর জীবনে সাপড়া ছোঁবে না। গঙ্গাফড়িং মন আবেগে ভেঙে উঠেছে। সে পরিপাটী করে চুল বেঁধেছে, আলতা পরেছে, কপালে এক মাথা সোনালী টিপ দিয়েছে। সরলমনা গঙ্গাফড়িং চিনে উঠতে পারেনি স্বামী তাকুলকে। তাকুলের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের ও ফেব্রিকের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সে তাকুলের কথার সার নিয়ে ফেব্রিককে বলেছিল, পলাশপুরে আলুকদার পশুপতি সোনার তাদের বসতভিটের জমি নিয়েছেন, সেজন্যই তাকুল গঙ্গাফড়িং পাঠিয়েছে নিয়েছেন। তারা পলাশপুরে গিয়ে খুব শাসিয়ে বাস করবে। ফেব্রিকেরও তাদের সঙ্গে চলে যেতে আনুরোধ করে। ফেব্রিক ঘটনা জানাই তাকুল অনুচিত কাজ করে। ফেব্রিককে পাঠায়, তার পাঠায় ঠ্যাং ভেঙে দেয় অপরাধ ছুটে। গঙ্গাফড়িং বুঝতে পারে, তার স্বামী তাকে ভুল বুঝিয়েছে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে সে বলে ওঠে—'আমাকে ছল করেছো তুমি?' স্বামীর দিকে আগুন ঘরে তখনও জ্বালা জুড়াতে চায়। স্বামীর বাক্যায় ছিটকে পড়ে যায়। ভিতর থেকে আরও বের হয়ে আসে গঙ্গাফড়িং। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়। স্বামীর অবহেলায় নিজায় যে গঙ্গাফড়িং মন অভিমান হয়ে উঠেছে সেই গঙ্গাফড়িং এখন স্বামীর মৃত্যুকামনা করে। স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। শয়তান স্বামী, মধুপুর মায়া হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে তার নখীছেদ নিয়ে ছুরে মারতে ইচ্ছে করে। একটি ভাব, আক্রোশ গঙ্গাফড়িংকে ছেয়ে ধরে—'ভোমন্ বিন না খালার কালকূট ছেলে ও আমার সন্তানটিকে হত্যা করে।' যা হিসেবে গঙ্গাফড়িং এই দুশ্চিন্তা ভাবনাগুলি, খুবই স্বাভাবিকভাবে। তাই সে ফেব্রিকের কাছে এসেছে, স্থানীয়ভাবে ফেব্রিকের বাড়িতে থাকা করতে। সে জানে, কাজ দেখে নিজের মতো গড়তে পারলে সে আর আর সন্তান। নিজেদের আকাশে সে তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য ফেব্রিকের

কাছে সুখ আশা করে। অন্তুল যে আঘাত দিয়েছে, আবার ফেলিসাকেও দিয়েছে—সেজন্য সে দীপার করে। সবাইকে দীপার করতে শিখেছে পঞ্চাননি। তার চরিত্রের সরলতা ও নির্মলতা আমাদের মুগ্ধ করে।

ফেলিক সাহেবের সঙ্গে পঞ্চাননির সম্পর্ক বড়ই মধুর। পঞ্চাননি ফেলিসের সংসারটি মধুরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মা। উভয়ের সম্পর্ক যেন পিতা-পুত্রের মেহ - ভালোবাসা, সমবেদনা আর সহমর্মিতার সম্পর্ক। ফেলিসের প্রতি তার যেমন কঠোর আছে, তেমনি আশার আছে। সে গভীর মনোযোগ সহকারে ফেলিসের কাজগুলি নৈপুণ্যের সঙ্গেই নিজে নিজেরে। ফেলিস মোহনের অন্তরে যতগুলি খাঁ-ন উপেক্ষাবোধ জন্মগ্রহণ হলে, তার মোকে পঞ্চাননি ফেলিসকেই দোষারোপ করে। ঘটিটি মোহনকে ঘটিত করে শীতলপাটিতে বসিয়ে তার পিতামের জন্য অন্তুল নিয়ে ফেলিস ঠিক কাজ করেনি—একথা ফেলিসকে স্মরণ করিয়ে দেয় পঞ্চাননি। ঘটিটি সম্পর্কে ফেলিসকে সতর্ক করে দেয়—'এরা এরকমটি ছিল। জলাবসন্তর যারি মানুষেরে কলমবাবার খুতে মেলে।' ফিরিয়ার মোহন ফেলিসের কাছে নিজের জন্য অন্তুল নিতে এলে পঞ্চাননি মোহনে মেটি পড়ে। মোহনকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ভর্ৎসনা করে, তিরস্কার করে, অপমান করে। আসলে পঞ্চাননির চরিত্রে এক প্রতিবাদিনী সত্তা আছে। অন্যায়, অবিচার, অসম আচরণ সে সবসময় বিরোধিতা করেছে। মোহন ফুলকলসর আসার ফেলিসকে দিগন্তে মেলাতে এসেছে মনে তার মনে হয়। তাই সে ফেলিসকেই ফেলিসকে সতর্কমান করতে চেয়েছে—'আলো চাল মোহ আপনা তারাতারি। মোহন মোহ আচরণ কারণ এরকমি পথ মেলে এসেছে একা একা। আপনারে বাসস্থানান ফুলাতে, হাঁ। আর এমন মোহমায়ুমের আশায়ে মেলে মোলে আপনারে মিটিয়ে মোহ মেলমেলন মোহ পাশে দাঁড়াবে না, হাঁ।' কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে, মোহন আল আরিতে আছাড়ায়। অন্তুল মেলমায় ফিরেপেই সে ফেলিসের কাছে এসেছে, তখন মোহনের মরি আর সহ্যানুভূতি আগে। মোহনের আল দাঁড়ানোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। ফিলফিল হয়ে ফেলিসের কাছে জানতে চায়, মোহনকে সে বাঁচাতে পারবে কি না? পঞ্চাননির এই আচরণগুলি আমাদের অভিভূত করে। আবার মোহন যে তার কৃতকর্মেরই ফলভোগ করছে, মোলমেলন সে নির্লিপ্ত স্বরে করিয়ে দেয় মোহনকে—'আমা আচরণ নষ্টিমাহেনা, যে খুনের আপনের আল বাঁচাবে, মরিয়াবন্ধু না নিয়ে সেই খুনখটিকেই কি না আপনে আগে আটিলাবেন।' মোহন যায়, অভিজ্ঞা পঞ্চাননির আচরণ কিছু মোহন নিয়েছে, কিন্তু মোহন নিয়ে পারেনি তার সমস্যা ও বিপদকে। জীবনের অভিজ্ঞতায় সে সহজ কথাকে সহজভাবেই বলতে শিখেছে।

পঞ্চাননি প্রতিবাদ করে। হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, মজলায় সে নিপুণ। আহমেদ সঙ্গে, মোহনের সঙ্গে সে মাঝেমাঝে ঠাট্টা তামাশায় মেতে উঠেছে। ফিলিপি আহমেদকে সে আশা করে বলে—'সেই কথা ফিলিপির পাকলাই বাদনা, কী প্রয়োজন পাপিটির কলিজা ছিঁড়ে।' আবার ফিরিয়ার মাংসের ফিরিয়ার মূল্য, ফেলিস যখন আকে বলে, তার কাজগুলি মোহনা যায়, তখন সে মুচকি হেসে বলে—'কাজগুলি-এর অভিমকে মো কাজ না।' তার প্রতিবাদ যেন মোহনিকাদের ছুঁয়ে যায়। কখনও কখনও তার কথা মোহে যাবে পড়েছে, তীব্র শ্লেষ। যায় মুখুরে ফেলিসের সংসারে সে কি করেছে, মোহনের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সে তীব্রস্বরে মুখর বলে—'মোহনা পাকিয়ে... মোহনা মোহনা। ... মাঝে মাঝে বিমুখের পঞ্চাননিও পাই।' এই রসপ্রবণতাসম্পন্ন নারীর নিজেরিনী মূর্তিও আমরা মোহনে পাই। পশুপক্ষির সহজ জলনায়ের কাছ মোকে আমরা আরো পাই যে, পঞ্চাননি নিজের হাতে নিমুলনাকে ফাঁসী কাষ্ঠুলনাকে ধরা করেছে। তাইই আমরা তার গলায়

রেগে সে অঙ্কুরকে খুন করেছে। বলা যেতে পারে, খুন করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ অঙ্কুর একদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গামণিকে বেশ্যাবৃত্তি শিখিয়েছে। যেমনটি সে ভেবে রাখেনি। তার দু' বছরের সন্তানকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আর এখানেই গঙ্গামণি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। যে আশঙ্কায় সে ভীত হয়েছিল, সেই যন্ত্রণা ক্রোধের আগুনে পরিণত হয়ে সে হিংস্র হয়ে ওঠে। অঙ্কুরকে হত্যা করে দিনদিনের অত্যাচার, লাঞ্ছনার সে প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু আদালত নিষ্ঠুর পরিহাসে আসামীর আসনে সরকারী পুরস্কার সে পায় না। পায় সেই ব্যক্তি যে আসামী ধরেছে।

হেকিমের জীবনের শেষ দিনের হেকিমের পাশে থেকেছে গঙ্গামণি। গঙ্গামণির কোলে মাথা রেখেই হেকিম চিরনিদ্রায় শায়িত হয়। গঙ্গামণি এখন সাহেবপাড়ায় থাকে তার সন্তানকে নিয়ে। অঙ্কুরকে খুন করার অপরাধে সমাজ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। গঙ্গামণি এখন হেকিমের দাওয়াই প্রস্তুতের প্রণালী শিখে ফেলেছে। জেনে গেছে, দাওয়াই বানাতে কটি উপাদান লাগবেই, বিছুটের অন্তলবি অর্থ অবশ্যই বহুপ্রচলন। আদুরবাবুদের উপর তার অভাব পূরণ করতে হবে না। নিজের আত্মপ্রত্যয়েই সে দোকান খাড়া করিয়েছে। সেই গাছ দোকানে করে দেবে। নিজের আয়ের প্রতি বিশ্বাস জেগেছে গঙ্গামণির। হেকিমের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে সে। হেকিমের অসম্পূর্ণ কথাকে বাস্তব রূপ দিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দৃঢ় প্রত্যয়ে সে উচ্চারণ করে—'আমি যদি না হতে দুখা, তবেও পারো তোমরা বলে আমায়, মরে রানব। আমার বিশ্বের বিছুটের অন্তলবি উঠল, সেই অন্তলবির মরে রানব।' গঙ্গামণির এই সংলাপে নাটক শেষ হয়। কিন্তু শেষ হয়ে যায় না হেকিমের আবিষ্কার। হেকিমের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়ে গেছে গঙ্গামণির বুকে। গঙ্গামণির জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সেটিই। তার আত্মজের ভবিষ্যতে সে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। হেকিমের আবিষ্কৃত পথেই সে হয়তো আবিষ্কার করবে নিরাময়ের পথ। সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেছে বন্ধু হাশেমকে। সকল বাধাকে জোরের মুখে করে গঙ্গামণি এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এই স্বপ্নই গঙ্গামণির চরিত্রকে আলাদা একটা মাত্রা দেয়।

হাশেম : গুরুত্বপূর্ণ এক আকর্ষণীয় চরিত্র

'দস্ত হেকিম সাহেব' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় চরিত্র হাশেম আলি। হাশেমের প্রথম ও প্রধান পরিচয় সে ভিখারি। অসহায় বুড়ো ভিখারি। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই হেকিমের কুটিরে আমরা হাশেমের দেখা পাই। নাট্যকার হাশেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—'হাশেমের পিঠে ঝোলানো থলির মধ্যে তার যাবতীয় সম্পত্তি-ছেঁড়া কাঁথা, জামা কাপড়, টিনের থালা ইত্যাদি সঙ্গে একটি অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি আছে। ভিখারি হাঁকে হাঁকে ভিক্ষা করে খাওয়া যায়।' লক্ষণীয়, ভিখারি হাশেম স্বাভাবিক ও সুস্থ দৃষ্টি দিয়ে। এ ব্যাপারে হাশেমের নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা আছে। এ নাটকের অন্য একটি চরিত্র যখন তাকে সচল-সুঠাম হয়ে ভিখারি ভিক্ষা করতে বসে অন্যায় করছে বলে বারণ করে তখন: কোন দিয়ে? হাশেম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—দিয়েছে নাকি। কপালে আছে। একসময় তো বেগারই ছিলাম: সেই রোজগারের একটা ঠিক ধরে রেখেছি যে সহজ।' বোঝা যায়, হাশেম জাত ভিখারি নয়, অভাবের বিপাকে পড়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে।

সহজ, সরল বুদ্ধির অধিকারী হারেম। আর অসাধারণ পাকস্থলীর ছিল। খাবারের দোষ-গুণের ধার ধারেন। ফলে খাবারে নির্মম পরাজয়ে সে অবলীলায় জিহাদ করে। ডেলিমের কথায় আমরা জানতে পারি, হারেমের হাত পায়ের শিরাগুলি জট পাকিয়ে গেছে, মেয়ের রক্ত চলাচলে ভীষণভাবে ব্যাঘাত ঘটিয়ে। এ রোগের চিকিৎসার জন্য রাই চড়াই পাখির মাংস। আজও তা দিয়ে ডেলিম তৈরি করতে হারেম জটিল ঘুম। ইউনানি চিকিৎসার একমাত্র অবলম্বন বন্ধুর। চল্লিশ বছরে ডেলিমের ঘটিকে হারেমে হারেম। কিন্তু ডেলিমকে সে সবসময় অনুযোগ করে—'... সে বাপ, আমার জিজ্ঞাসে সে। তোর মেজিন বাপ, পুরা জিজ্ঞাস না পুরা সেরাসে সেরাসে আর আমাকে জিজ্ঞাস দিতে না। আমার জিজ্ঞাসে বন্ধ চলুক, বাইরিয়া আমার এমনই আরাম থাক।' আসলে হারেম জানে, তাকে জিজ্ঞেস করেই সেটির জ্বালা মেটাতে হবে। কিন্তু মুশকিল, সরল জিজ্ঞাসীটে কেউ জিজ্ঞাসা সেরসে। ফলে বাস্তবের সঙ্গে, সহানুভূতি আসার সবসময় হারেম কখনও কখনও অনুপস্থিতির জন্ম সবসময় হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসে সুস্থ থাকলে সে সরল থাকবে, আর মাইগ্রে অনুপস্থিতির জন্ম থাকলে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসে। সহানুভূতি যা আর হারেম জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেকজিনু জেগেছে, অনেকজিনু শিখেছে। আমরা জিজ্ঞাসি আজে সে যে আরও দিন জিজ্ঞাসি, আরও বেশি অভিজ্ঞতালিক-এই বাস্তবতার আর জিল। গল্পকারিনি হারেমে স্বামী অনুজ আজে পলাশপুরে যেতে বলে সেখানেও শত শত জিজ্ঞাসি আজে অনুজের মুখে একথা শুনে হারেম মনে মনে বলে—'মুর হ। শত শত জিজ্ঞাসি থাকলে তো আমি সেখানি সরলুম সেলম।' সেকথা সত্য, অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কেই হারেম জীবনযাপনে সচেতন।

হারেম ডেলিমকে আদরসোহাগে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, আর গল্পকারিনি প্রতি তাঁর সম্পূরকপূর্ণ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা আছে। গল্পকারিনি সঙ্গে তার সম্পর্ক সহজ অনুজ। গল্পকারিনি ডেলিমের সংসারেই মূল উপকরণ সরবরাহকারী হারেমই তৈরি করে। এই আদরসোহাগে ডেলিম তাকে ভিক্ষাবার করে তাড়িয়ে দেয়। গল্পকারিনি প্রতি ডেলিমের এই মুহূ ব্যবহার হারেমকে আহত করে। এক মুক অভিমান নিয়ে সে ডেলিম অর্পণসা করতে পারলেও দুই মেয়েটির সেবাসি। আর মুলত পারি সোনায়। বীসবছরের যাবিয়া তো সেরা বী-বী। এজন্যেই সে আসল সখা উপস্থিত করে। ওরাসি বী-র সেবাসে যাবিয়া এবং ওরাসি বী-র যাবিয়ির বন্ধনে। যাবিয়ির সেবাসে সেবা অনাসাসে। সেবাসে ছাড়া তার এক দন্ড চলে না। তার হাতে, মাথায়, মুখে, বীতে সেবাসে। ওরাসির যাবিয়ি হিসেবেই প্রথমতে সে উপাসন করে। অর্থাৎ এ নাটকের মূল মনের আসল হারেমের অবস্থানেই স্পষ্ট হয়। মুহ বাস্তব কথা বলতে হারেম কখনও পিছপা হয়ে না। গল্পকারিনি তার স্বামীর অপরাধমূলক কাজ কর্মের সমালোচনা করলে হারেম তাকে সরল নিয়ে বেহ-'আরে ধনি, মানুষ চেনিয়ে অনুজ সে এতো এতো আর কয়ে আসে, তোমরা তো সেটি নিনি খায়।' ডেলিমের সাবধানি তৈরির জন্য খনি সেবাসে আসলে ডেলিম নিজের অজান্তে। খনি মূলে ডেলিমের সাবধানি তৈরি হয় না। ডেলিম ভালো কাজ নিয়ে হারেমের দিকে তেড়ে যায়। নিজের কাজের সমর্থনে সে যুক্তি দেখায়-'ই, এই মেয়ে আমরা বীয়কে খনি ... আর, এক সাবধানি নিলমি হয়ে যায়। মানুষের তেয়ে সাবধানি-এর জনর বেশি।' হারেম আসাইক তেটি সেটির অনুজ তোমায়। এটো পাতা তেটি তেমনি, তেমনি, বিরিয়ানি, খান তেয়। কিন্তু তার আহারস্থান তেয় আছে। তাই ডেলিমের কাছে তার আসনে সে সবসময় করে চলে যায়। সাবধানি সময় ডেলিমকে জানিয়ে যায়, তার মন খুব ছোটো হয়ে গেছে।

হারেমের কণ্ঠে সুর আছে, মনে মুর্তি আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই গল্পকারিনি মুখনি তেয়ে সে

গান ধরে-'কলিতে যা ধরিলে কলি সে যায় না .... ।' দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের 'এ কথা সত্য সে কথা..' গান করে। তার গানে ও কথাবার্তায় আছে উঁচু শ্রেণি। ওরালি মেকিমকে ভুলোবেশী ভেবে তাকে ফলমূল পরিবেশন। হাবেমের ঘরে এটি 'ভুবি ভেবে কলমান।' ওরালি মেকিমের জন্য চিঠিতে—বন্ধুত্বের মূলে একথা পুনঃ হাবেম কর্তৃক করে—'এক পুড়ি চিঠিতে।' নিজের আত্মভূমির প্রতি হাবেমের গভীর ভালোবাসা আছে। তার ভালোবাসার আবাহনে অভিভূত করে। পরিব্রাজক ও পলাশপুরের অন্যান্য প্রতিবেশিদের সে পরিব্রাজক বলে ওরালি খাঁ-র পক্ষই নেয়। আকাশ অঙ্কুল পলাশপুরে ভুটিপাই, খুনখারাপি করে বলে পাঠালেও সে অঙ্কুলের কাজকে সমর্থন করে। ফলে পলাশপুরের পশুপতি অঙ্কুলকে খাঁচিয়েছে খুনে হাবেমই প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করে। অঙ্কুল মেকিমকে পলাশপুরে নিয়ে যেতে চাইলে সে মেকিমকে সতর্ক করে দেয়-'ওরে মেকিম, তোমার মনুষ ভোরে এক ভালোবাসে। ভোর মেমরে বড়ি দিতে ছুটে যেন দিনু দিনু। সেই সব আনন্দময় ছেড়ে পলাশপুরে যেতে চাস? হাবেমের নিজের সন্তুর মেকিম পলাশপুরে যায়। নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে মৃত্যুর্যায় অবস্থায় ফিরে আসে পরিব্রাজক। আবার যৌবন ফিরে করে চলে যাওয়ার জন্য হাবেম মেকিমকে অনুনয় করে। মেকিমের পোস্টমর্টেমে সে পড়েছিল। মেকিম এলে তাকে পড়াবে তাকে। হাবেমের কাছে মেকিম সব গোপন করতে চায়। হাবেম কিন্তু মেকিমের সব ফলাফই জেনেছিল। তাসুকপাতের লিখিত তার হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, তাকে আক্রান্তাবে নিয়েছে করেছে। তাই মেকিমকে সে মৃদু অনুনয় করে বলে—'যা যা, যেখানে ইচ্ছি সেখানে যা। একজন যদি ছেড়ে থাকতে পারলি তো পারি নিজে পারবি। পশুপতি ভোরে ফিরতে বলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তোরে নিব কেন। কেন নিব?'—এখানে হাবেমের রাগ, অভিমান, ঘৃণা, মেকিমের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অনাবিল স্নেহমমতার প্রকাশ লক্ষ্য করেছে। গলাধাক্কা তার ঐতিহ্যের স্বাধীনে খুন করে তখন পুলিশের পায় না। এ ঘটনায় হাবেম স্বাধী পেয়েছে। তার মনশ্চিকল্পনায় আমরা মুগ্ধ হই। ফিল্মের ঘানাটি উঁচুতে তুলে ধরে সে পরার ভোরে পড়ে।

এই নাটকে হাবেম এক মুহূর্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেকিমের আসামান্য আচরণে সমাজ ও শপথ নেয় হাবেম। এ কাজে সে পাশে পেয়েছে পলাশবাসীকে। মেকিমের অন্যায়ে বাধাদে খুন দিয়ে এগিয়ে এসেছে হাবেম পলাশবাসী। মেকিমের সাফল্যে সবচিন্তু স্বার্থ ত্যাগে দেয়নি হাবেম। মেকিমের আজন্মলালিত পুঁথি যেখানে তার বাবাহাই-এর সব উপকরণ লেখা ছিল, সেই মূল্যবান পুঁথিটি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল হাবেম। পরিব্রাজকের ওরালি খাঁ-র অন্যায়ক দাবির কথা শুনেও সে সেটি তুলে দেয়নি মেকিমের হাতে। একারণেই সে ওরালি খাঁ-র প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছে। অত্যাচারী শাসককে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। ওরালি চলে গেলে, মেকিমের দেহ নিথর হয়ে গেলে হাবেম পুঁথিটি দেয় করেছে। মেকিমের পলায়নীতে। তারই যে মেকিমের সাধনাটিকে বৃথা হতে দেয়নি। বাবাহাই সম্পূর্ণ করতে পুঁথিটির বড়ো প্রয়োজন। তাই সে পুঁথিটিকে আগলে রেখেছে। পাশা খুলের সমাধেশে পরিব্রাজক হাবেম প্রতিটি পরিবেশন শেষে আলাদা একটি মালা পেয়ে যায়। মেকিমের পুঁথির সংরক্ষক হাবেম যেন মেকিমের হাতের ঘানিনটির নিজের হাতে তুলে নেয়। তুলে নিয়ে শুরু করে টোড়। জীবনের নতুন টোড়। নতুন আবিষ্কারের জন্য, নতুন সাফাহাই-এর জন্য, নতুন সাফাহাই সালাবেশ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

মোহরবাই : সামান্য বাইজি নয়

'নয়া হেকিমসাহেব' নাটকে মোহরবাই চরিত্রটির আকর্ষণ নজর কাড়ে। মোহরবাই [illegible], কলকাতার বাইজি। [illegible] এ নাটকে যে সমাজ প্রতিফলিত, সে সময়ে রাজা-জমিদার, জমিদার-তালুকদার [illegible] বিনোদনের জন্য বাইজি পুষতো। [illegible] সমাজের অঙ্গ ছিল মোহরের মতো বাইজিরা। এ নাটকেও মোহরবাই সমাজের অঙ্গ। [illegible] তালুকদার [illegible] মোহরকে টাকা দিয়ে পুষে রেখেছে। [illegible] মোহরকে [illegible] হয়েছে। [illegible] মোহরকে কাজে লাগিয়েছে। [illegible] হয়েছে নানা [illegible] কাজ করতে। [illegible] চর হিসেবে সে [illegible] এসেছে। [illegible] মোহরকে [illegible] এনেছে। মোহর তখন [illegible] নিয়ে কলকাতা থেকে [illegible] যাচ্ছিল। [illegible] তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। নাটকের [illegible] আমরা এ [illegible]। [illegible] গোলাপ ছাড়া বাইজির এক মুহূর্ত চলে না। তার হাতে, পায়ে, মাথায়, বুকে [illegible] গোলাপ। [illegible] আসলে [illegible]। সে [illegible] মোহরকে [illegible] নিয়ে আসতে হবে [illegible]। [illegible] জানা যায়, [illegible] সে [illegible] ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তার নিজের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করতেও সে সাহায্য করেছে।

নাটকে আমরা তার [illegible] রূপে। মোহরবাই [illegible]। [illegible] এক [illegible]। [illegible] সে [illegible]। [illegible] এসেছে [illegible]। [illegible] সে [illegible] করে—'[illegible] আমি [illegible] করে নিয়েছি। [illegible] এ [illegible] লাগে।' [illegible] দেয়। [illegible] সে [illegible]। সে [illegible] হয় না। এক্ষেত্রে তার [illegible] আছে। [illegible] করে সে। [illegible] এ বিশ্বাস তার ছিল—'[illegible]।' [illegible] আগে সে খাঁ সাহেবের [illegible] গেছে। [illegible] সে এসেছে [illegible] নিতে। [illegible] সে [illegible] লাগিয়েছে। [illegible] বলে সে [illegible] গেছে। [illegible] এক [illegible] বাইজি। [illegible] স্বীকার করেনি। [illegible] হয়ে যায়। [illegible] সে [illegible] থেকে বিদায় নিয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

সে স্বীকৃতি দেয়। উপলব্ধি করে, তার যা বলার তাকে তো বলা হয়েছেই, কিন্তু বেদিয়া যদি সনাতনপুরে থাকে, তাহলে সেখানকার সাধারণ রোগীদের খুব উপকার হবে। সনাতনপুরের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। নাটকের শেষে হঠাৎই জানা যায়, বেদিয়াদের ওষুধ খেয়ে ছেলেরা সুস্থ হয়ে উঠেছে। এ সংবাদে আমরা খুশি হই। ছেলেরা আমবাগানে সুস্থ হয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে গেল কি না সেকথা নাট্যকার আমাদের জানাননি। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে, ব্যক্তির সমাজেরই ব্যাধি শরীরে বহন করেছে ছেলেরা। অসুস্থতারই রোগের বলি হয়েছে সে। সমাজের বিষ পান করেই সে হয়েছে বিষাক্ত। তার শরীর থেকে সেই বিষ বের করে ফেলে, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ছেলেরাই সুস্থ হয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পাক—এটাই কামনা। নাট্যকার মনোজ মিত্র সেই আশারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ফলে গোটা এ নাটক সমস্যা এক বাস্তবিকতা নয়, অসময়ের মানবী স্বপ্নের অভিব্যক্তি।

৯.৭ গল্প হেকিমসাহেবের সংলাপ ও ভাষা

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমালোচক A. Nicoll তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে নাটকের সংলাপ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন— 'It is through the dialogue and through the dialogue alone as interpreted by the actors, that he can convey his story to the assembled audience.' অর্থাৎ সংলাপই হ'ল নাটকের প্রাণ। নাটকের প্রধান আশ্রয় সংলাপ। কথাসাহিত্যের তুলনায় নাট্যকার অনেক বেশি পরাধীন। কোনো চরিত্র, ঘটনা কিংবা পরিবেশ নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা করার স্বাধীনতা তার নেই। সুতরাং তিনি চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়ে নাট্যকাহিনির উপস্থাপন, অগ্রগতি, চরিত্রের শ্রেণিগত অবস্থান, তাদের মানসিকতা, রুচি ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এ চরিত্র উপযোগী সংলাপ না হলে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও নাটকটি ব্যর্থ হয়ে যায়। সংলাপ হবে হবে আকর্ষণী, জীবন্ত, স্বাভাবিক, নির্মেদ ও কৃত্রিমতাহীন। নাটকের একটি সংলাপের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আরও অনেক সংলাপের বীজ। এই প্রেক্ষাপটেই মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের সংলাপ বিচার করতে হবে।

মনোজ মিত্রের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে যে ভঙ্গি আছে তার মূল উপাদান সরসতা। অভিনেতা মনোজ মিত্র থাকলেও তাঁর নাটক কিছু ভঙ্গি সর্বস্ব নয়। তাঁর নাটকে অভিনেতার দীর্ঘশ্বাস নেই, মেলোড্রামার আতিশয্য নেই, আছে সংলাপের সরসতা, চমৎকারিত্ব ও কাব্যত্ব। তাঁর নাটকে যে কৌতুকের ছোঁয়া থাকে সে কৌতুকের যে আমেজ। তাঁর নাটকের সংলাপে একটা অদ্ভুত রসধারা আছে। তাঁর লেখা তাঁর সংলাপ যেমন পাঠক-দর্শকের মনে দোলা লাগায়, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের অভিঘাতে ভাবনা জাগায়। তিনি নিজে জীবনরসের রসিক বলেই যে কোনো চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ নিয়ে সুন্দর রসিকতা করতে পারেন। তাঁর নাটক পড়তে পড়তে কিংবা দেখতে দেখতে আমরা হেসে উঠি ঠিকই কিন্তু পিঠে এসে পড়ে চাবুকের আঘাত। অমি থাকে মুখের মিঠে কেবল মধুর কখনও কখনও কৌতুকে উঠি। তাঁর 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটক সম্পর্কেও একথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। এ নাটকের শুরুতেই আমরা ফকিরকে দেখতে পাই। ফকিরের মুখে তিনি এমন সংলাপ বসিয়েছেন, যাতে প্রমাণিত হয় কত কম কথায়, কত গভীর ব্যঞ্জনায় সেকালের গ্রাম বাংলার সমাজ, ইতিহাস, মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। লোকমুখে শোনা হেকিমসাহেবের মৃত্যুকে

সাধারণ কথোপকথনে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলে অভিনয়। তার মুখে 'কালঝাড়ের' শব্দটির ব্যবহার খুবই আন্তরিক। অভিনয় চলাকালীন কথাকারের সঙ্গেই নাটকের কথক, বিশ্লেষক হিসেবে নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সেলিনের প্রায় শব্দগুলি তার মুখে বেশ মানানসই হয়েছে। যেমন 'বালসাড়া', 'উপুড়মুখ পাখি', 'খী-গন্ধ', 'ভোর', 'নিশব্দসাপে', 'লোকজ', 'একাকে' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহারে বাঙালমেশের গ্রামীন প্রাণে ও সাধারণ মানুষের মনি ফুটে উঠেছে। ছোটো ছোটো বাক্যগঠনে চিত্রকল্পটী বাক্যালঙ্কার ব্যবহারের সার্থকতায় ফুটে উঠেছে সর্বত্র—'সেদের বাজা হিয়ারে, হিয়ারের ভেলা অভিসারে, অভিসারের অভিসারক মানুষগুলার অহংশিক্ষার ভেলগুলিরে—চিরস্থায়ী বাক্যবন্ধের সাধারন মানুষ অন্ধকারেই...মুক্তক ভেবল বাজলা। মানুষ মরছে মানুষ, বাজনা হাসি।' নাটকের পরবর্তী অংশে যখনই অভিনয় চিত্রায়িত হয়েছে তখনই সে প্রায় আমার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সুন্দর সেতু রচনা করেছে। তার সংলাপের সাধারণ সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে।

নাটকের ও নাটকে ব্যবহৃত খী ও পশুপাখি সেলিনের চীন প্রতিবেশিদের বেশ কিছু কৌতুককর ছবি অঙ্কিত করেছেন নানান অভিনয়ে। নরিয়াগাঙ্গের ও পলাশপুরের মানুষজনের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে তিনি যেমন আনমনা বিরেছেন, পাশাপাশি তাদের ধর্ম, অন্ধবিশ্বাস বীমাসেবা টেনেছেন শাসক হাত ধরে। নরিয়াগাঙ্গের মানুষজনের ব্যবহৃত খী, তার ভোগাভোগ পরাক, নাচের ভঙ্গিমি, খাদ্যাভ্যাস অন্ধবিশ্বাস সংলাপে প্রচুর আঞ্চলিক-আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত বিশেষটি বোঝা যাবে। যেমন ব্যবহৃত সংলাপ—'তুমি হুধ কথাই ঘালক টেরিনি, হুধ কথা। মানুষের হিসাবে আমাদেরই কর্তব্য ভাড়াভাড়ি করা, পরামর্শসভা করা, আলোচনা সাপাই করা, বাবার পরিত্র কথা বিধি অভিযোগ...হুধ কথা।' সংলাপপুরের মানুষজনের পশুপাখি, খোদাকা দুর্গীয় সংলাপে সংক্রামকভাবেই ব্যবহার করেছেন সেলিন, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, তৎসম শব্দ। পশুপাখি ব্যবহারিকে 'খীসাহেব' সম্বোধন করে মন্তব্য করে—'খুশি হয়েছি ঐতুকমশাই। আমার প্রতিবেশির যে সম্পত্তিতে মন লেগেছে, এটাই বড় কথা। তাঁর মত উচ্চমনীয় শিক্ষাবীর কেন যে এতকাল এখিনে সমান দেননি, এটাই বিস্ময়ের।...খী সাহেবকে আমার সমস্যা জানাবেন।' পশুপাখির কণ্ঠে 'ঐতুকমশাই' 'খুশিমশাই', 'ভোবমহান' 'মনান' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে হিমুস্রাবিত রূপ স্পষ্ট হয়।

এ নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র সেলিম সাহেব। সেলিমের সমস্যা, অন্ধকার, নিষ্ঠা, সাধনা, উপাসনা, সাধক মনটি সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত। গল্পকথনিতে সেলিম নিজে আপের বয়ানে আমা আপ নিয়ে যায়, কিন্তু নিজের আমা আপ সে কি করে বোঝে? যখন সে বলে—'সমস্ত আপে আমার, মুক্তক ওয়াপস... (ভোবে) আমি নাই। সেটিরিটি তুমি হও। আমি তুমি সাধনে। সাধ, সাধ আমার যা মেরিয়েলে খুশি মনে সাধ...' বোঝা যায়, গল্পকথনির প্রতি সেলিম খুবই সচেতন। আত্মসচেতন সেলিমের মানুষ বোঝাপড়া। সেলিম অন্ধকারেই খুশি। কিন্তু এই সেলিমই গল্পকথনির কর্তাদের অবহেলা দেখে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে—'তুমি গভীর ধান না কাটে নাই কাটিলে, কিন্তু খুল আবাদটাই যখন তোমার এতোই অসহনীয়, যার ফল হয়ে আর আসবে না তুমি...' এখানে সংলাপের সরলতা নেই, আছে ক্রুদ্ধ কঠিন আর। সেলিমের চরিত্রের ভিন্নমাত্রাকে ফুটে ওঠার জন্য এ সংলাপ খুবই অনুকূল ছিল। সেলিম তোপাদারা মা আবাদের জীবন অভিজ্ঞতায় সাফ।

বন্ধুর হেরিটেজ তার মেনেজ কীভিনাভি নেই। বন্ধুর হৈরিত্ত ক্ষেত্রে তার একটি ঐতিহাসিক মন বাজ করছেন। বন্ধুর হৈরিত্ত প্রসঙ্গীর মধ্যে তাহেছে কবিতন আমেজ। হেনিম পন্ধাবর্দিকে বলে—'তারহোর একটিনা ক্ষেত্রেন বাহে, শীতল বাতাস বাহে...হেনিমের শরবাহি দুপলত দুরবি বাহ, ফলাহের মেহের বাহ...মনু বাহ, দুপলাদি বাহ, বাহের সমুক্ত বাহ...আহেন দুরা আহ। আমরাহের দিনাহহেরা কাহেন ক্ষেত্রে বিদুহেরন অনকটি টিহেলে, সেটি অনকটিন বাহ।' এ সমাদ মেনে আধুনিক কবিতার পাহি। বোঝা যায়, হেনিমের আহ্বাদে টিকি আহছে নাটিকার মনোরমিত্রের কবিমন। শব্দের ব্যঞ্জনায়, পদবাদিহেরা, ছন্দের তালে এ নাটিকের এরকম অনেক সংলাপই কাব্যধর্মীপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হেনিমের বক্তব্যে নাহক খুন বিয়ে, তার আপস্পূর্ণ বাহকে সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছে নাহকাহবি ও হাহেরা। আহের সংলাপে, কাব্যধর্মীয়তা মাঝে মাঝে কবিতে হয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা কল্পনায় তাদের তর বাহে সংলাপ বলছে। কখনও কখনও এ নাটিকের সংলাপ হয়েছে মেনেটিম। নাটিকার অধিকাংশ মনোভাবনে তাঁর চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন। মোহনবাঁশি তার কৃষ্ণকর্মের জন্য অনুতপ্ত। হেনিমকে সে লিখা অপরাধ নিয়ে অপমান করেছে, ক্ষুব্ধেছেন্টি পাঠিয়েছে, নাকে খত দিয়ে বাদা বাহছে। সেই হেনিমের কাছে এসেছে নিজে চিকিৎসার জন্য। বন্ধাবর্দির কাছে সে স্বীকার করেছে—'আমার মুর্খামির মোহন আহার সেই বহিন। কী মোহনবাঁশি বাহেছি মানুহরিকে!' এই অর্থে নাটিকার নায়কম হিসেন। মোহনবাঁশি-এর মুখে অতিরিক্ত সংলাপ বসানি। বসনে মেহনের অনুপোহনার নিবন্ধটি স্নান হয়ে অভিনয়ের বিনটি প্রাধান্য পেত। এ নাটকে নাটিকার অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত সংলাপ বসহার করেছেন। হেনিম, বন্ধাবর্দি, নন্দুনন্দি, হৌলনিন্দ সংলাপে অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্তভার স্নান আছে। এমনকি ছোটো একটি চরিত্র মোহনের ঘরানদী ফুপুর মুখেও আমরা এ ধরণের সংলাপ শুনি—'হেনেহিলাম নরিয়াপত্নের ভালুকনার মহিন মন্ন রাখতে আহেন। সেখানি মন দুরে বাক, আর ভালুকে স্নান পাঁচাবেটি পায়।' হেটিহাস মুখে এই বাদনিকমুলক সংলাপ আমাদের অভিভূত করে। নাটিকার সংলাপে ভিন্ন সমাদ, সমাজ, চরিত্রানুগিন চরিত্রিক হৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছেন যথাযথ সংলাপের মাধ্যমে। ফলে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি তাঁর বর্ণনা রীতিতে আমরা হয়েছে সহজ, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এ নাটকে নন্দুর চরিত্রে প্রসঙ্গে বলেছে—'দুধুর আসমানে চিলগুলি বাহেন পাখা দুধারা।' আর নাটকের শুরুতেই নাটিকার লিখছেন—'নদী-এর কলিজা মতো কালচে চিল আকাশে।' আর নাটিক শেষ করেছেন—'আকাশের ফেসে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের বিটি। আসছে হেলান।' সমগ্র নাটকে ধীর, ফোহনা, হেলান, প্রবীন, চিত্রাহের প্রতিটি চিত্রকল্প তাঁর ভাষা ও সংলাপ, সুন্দর সহজভাবে ফুল সাজ তার ভাবী ও আকর্ষণী।

৯.৮ বিভিন্ন গ্রন্থ-পত্রিকায় 'গল্প হেলিকপ্টার সাহেব' সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়া

'নাটকের হেলিকপ্টারের ও তাঁর আবির্ভাব ঘটনা ইতিহাসসম্মত যে ঘটা অনুচিত নয়। তবে মোদ্দা কথা, ঘটনা মোহনবাঁশীর আসলে মনোভাব ভিন্ন স্পর্শ করেছেন বর্তমানেরই এক সিদ্ধির বাস্তবতে, যার একদিকে

আজ সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলনের অঙ্গীকার, অন্যদিকে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও সেই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।'

[বিনোদ পলিহর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৭.০৫.১৯৮৪]

'মনোজ মিত্রের নাটকে একটা স্থীর আবর্তন তৈরি হয়ে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, আজ থেকে বেশ্যের বছর আগেকার এক প্রেক্ষিতের পটভূমে তিনি এমন এক মূল্যবোধ তথা দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করেছেন, যা ঐতিহ্যসিদ্ধতার পরিধি ছিন্নভিন্ন করে আমাদের নিত্যদিনের আকাশের সমস্যার সমাধানের মধ্যে ডুবে পড়ে এবং পুরাকালের পটভূমি ও পোষাক-আশাকের আড়াল থেকে আমাদের বিচার বৈশিষ্ট্যকরণ একটা বড় প্রশ্ন এ নাটকে আমাদের নিকট নিক্ষিপ্ত হয়...মনোরঞ্জনের এই নাটক যে শুধু একটি অনুপম ঐতিহ্যিক গল্প ফুটিয়ে তুলে তা নয়, তা অন্তর্ধারিত, রসপরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ আত্মবিশ্লেষী উপায়ে অনাবশ্যকীয় আবেগের এক অবোধ্য ছবি তুলে ধরে—যা নতুন ও সাহসিক নাটকারদের সাহসের সেতু মজবুত করার জোগায়।'

[পবিত্র সরকার, 'আজকাল', ০১.০৬.১৯৯৪]

'...বিনোদের নির্মিতে যা প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল বেশ্যের বছর পিছিয়ে যাওয়া পটভূমিকে এক আশ্চর্যরূপ দীপ্তি, সত্য, বিশ্লেষণের ঐতিহাসিকের জীবনসঙ্গিনি। শুধু তখন প্রেক্ষিতের ঘটনি মহাগগনে, সেন তার মুহূর্তে। এমন এক চরিত্রের সৃষ্টি যাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা (তরুণী খী এবং পশুপতি সেনগুপ্ত) বিভিন্নির করে তুলবে। অভিনেতার যে সম্পত্তি পাঠকের তথা দিয়ে নাটা উদ্ভাসিত হবে, তার প্রায় প্রতিটি মূলেই একটি করে নাটিক্ষিয়ার নাটকে নাটকটী মূলের ঠেলে সেবে।...আমাদের 'পক্ষ'-র প্রাণে প্রাণে আজ প্রেক্ষিত—দুটি পার্টিই মুখোমুখি হয়। প্রাক্তন আছে রোষ, সেটি প্রতিশোধ, চাই অন্নপূর্ণ, প্রেক্ষিতের আছে স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, লালসা, সেই অন্নপূর্ণ, চাই মুক্তি। কিন্তু মুক্তোপরই আছে স্বর্গীয়ের সমস্যাসুদ্ধি, মুক্তোরে। আর তাই সমস্ত কোরেই 'পক্ষ'-র সমস্যা। এই সমস্যার কথকথা আলোকোজ্জ্বল করে তোলেন নাটিকারের যার নাম মনোজ মিত্র, অনন্ত শেশব থেকে মুক্তে তাঁর যাপন পরিচিত পরিচিতে পরিচিতে আছেন পরিচালক যার নাম মনোজ মিত্র, মুক্ত থেকে যার কথা পীরমূর্তি এবং এবং লক্ষণীয় করে তোলার তোলায় চরিত্রিন হয়ে আছেন অন্য এক অভিনেতা যার নাম মনোজ মিত্র।'

[সন্তুষ্ণ ঘোষ পত্রিকার, 'নাটিশক্ষ সমাজ' তোতোরুম সংখ্যা, ১৯৯৭]

'...মুখবন্ধের পরি মতো এ নাটকের বিষয়বস্তুকে সামনে তোলে আমরা তোমাদের কলকে পরি এক ঘটি ঢেলা আলোকর নিপুণ ব্যবহারের সাথাে এসে হাজির হয়েছি। মাঝের প্রেক্ষিতের মতো আলোক বিশেষজ্ঞটি মুক্তোরোপ নাটির উপাদানের সাথাটি বলাবার উপকরণ পায় না। উপকরণ তোপাসনার অভিনেতা নিজেদের আর্থ মৌতাত, শক্তিমত্তার পরিচয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আলো বিশেষজ্ঞের কল সালসার শিকার হয়। বাজারের পথা পুরান আর করার মতো মুক্তের শ্রেণী শেষটেই পরোটাস্ন করে তোলাতোর করে নাটিক। তেমন বহুত আলোর প্রেক্ষিত আলোর আটি আজকে প্রয়োজিত।'

[দর্শিত ঘটিয়ারে, 'মুক্ত থিয়েটার' পত্রিকা, নভেম্বর-জানুয়ারী, ১৯৯৪-৯৫]

৯.৯ গল্প হেকিম সাহেব : মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

গল্প হেকিম সাহেব নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়—২৮শে মার্চ ১৯৯৪ অ্যাকাডেমিতে

নাটকের কলাকুশলী

মঞ্চ ও শিল্প নির্দেশনা	: খালেদ চৌধুরী	আবহ	: গৌতম ঘোষ
মঞ্চনির্মাণ	: কুমুদশ দাস	শব্দ প্রক্ষেপণ	: সোমেন ঠাকুর
আলোক পরিকল্পনা	: তাপস সেন	নেপথ্য কণ্ঠ	: ঊর্মিলা শুক্ল
আলোক সম্পাত	: বাবলু দাস	নাটকের গানের কথা ও সুর	: অমল সিংহ
পোশাক পরিকল্পনা	: মধুমিতা গোস্বামী	রচনা ও নির্দেশনা	: মনোজ মিত্র
রূপসজ্জা	: শক্তি সেন		

নাটকের ভূমিকায়

ফকির	: মেঘনাথ দাস	জনৈক	: মনোরঞ্জন মিত্র
হেকিম	: দীপক দাস	সহজশাহ	: অনিরুদ্ধ ঘোষ
হারেম	: তরুণ মুখোপাধ্যায়	অতুল	: দেবাশিস ভট্টাচার্য
শঙ্কর	: কুমুদ চৌধুরী	অন্যান্য চরিত্রে	: পিন্টু দে, জ্যোতি টমস, উজ্জ্বল ভট্টাচার্য, শঙ্করপ্রসাদ সরকার
ওয়াজিদ খাঁ	: মনোজ মিত্র		
হাবুকি	: অমিত মুখোপাধ্যায়		
আমিনা	: অমিত সেন	মোক্ষদাবুলি	: কাবেরী বসু
চৌলি	: মিতালী টমস	মেহেরশাহ	: কৌশিকা বিশ্বাস
দশুবাই পোদ্দার	: দীপক ভট্টাচার্য	বিন্দু	: মায়া রায়
তুনী	: বকুল রায়		

সুন্দরম প্রযোজিত গল্প হেকিম সাহেব নাটকের প্রচার পুস্তিকার অনুলিপি

এক ছিল হেকিম সাহেব। তার ছিল এক আশ্চর্য দাবা, যার পিঠে চেপে হেকিম সাহেব দাপিয়ে বেড়াতেন [illegible]—'[illegible], [illegible]।'

[illegible]

[illegible]

৯.১০ প্রশ্নাবলী

বিস্তৃত প্রশ্ন

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৯.১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। ছায়েম কে? তাকে দিয়ে নাটকের কোন উদ্দেশ্য সাধিত?

৮। হর্তুকি, বক্কর, তাকিয়া—চরিত্র তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯। এ নাটকে 'গোলাপ' কিসের প্রতীক?

১০।এই নাটকের নামে 'গল্প' কথাটি কেন প্রযুক্ত?

সহায়ক গ্রন্থ-পত্রপত্রিকা

১। *মনোজ মিত্র নাট্য সমগ্র (১ম খণ্ড)*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন

২। *গল্প হেকিমসাহেব : রূপকের আয়নায়*, ড. শম্পা মিত্র, রত্নাবলী

৩। *নাট্যব্যক্তিত্বের মুখোমুখি*, ড. অপূর্ব দে, দিয়া পাবলিকেশন

৪। *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র* (শারদীয়া ২০১১) সম্পাদক ব্রাত্য বসু

৫। *নাট্যপত্র স্যাস্* ১০ ও ১৩ সংখ্যা সম্পাদক সত্য ভাদুড়ী

৬। *গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা* নভেঃ-জানুঃ ১৯৯৪-৯৫ সম্পাদক রমন মাহেশ্বরী